প্রথম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক সফর

বস্তুবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বস্তুবাদের অন্ধকার উপত্যকায় তার জীবন অতিবাহিত করে। সে শয়তানী আকাঙ্ক্ষার সাগরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তানদের বস্তুগত সম্পর্কের ঢেউ এর আঘাতে এদিক থেকে ওদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে কিন্তু তা হয় নিস্ফল এবং সবশেষে হতাশা ছাড়া আর কিছুই পায় না।

কোন কোন সময় এ সাগরে সঞ্জীবনী দমকা বাতাস (জযবা) তার পিঠ চাপড়ে দেয় এবং তার ভেতরে আশার আলো জ্বালে যে, সে তীরে নিরাপদে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এ বাতাস সব সময় প্রবাহিত হয় না। তা কেবল মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

"তোমার জীবনে তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু সুখকর নিঃশ্বাস লাভ করে থাকো। একথা মনে রেখে তা থেকে লাভবান হও এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"

ঐশী দমকা বাতাসের অধীনে শিক্ষানবীশ কোনভাবে বহুত্বের পৃথিবীকে অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ভ্রমণকে সাধকরা 'সাইর ওয়া সুলুক' বা 'আধ্যাত্মিক সফর' বলে অভিহিত করেন।

'সুলুক' হলো পথ অতিক্রম করা এবং 'সাইর' হলো এ পথের ধাপসমূহ এবং মাক্বামগুলোর গুণাগুণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করা।

রিয়াযাত এবং আত্মশুদ্ধিমূলক কাজগুলো হলো এ আধ্যাত্মিক সফরের রসদ। যেহেতু বস্তুগত সম্পর্ক পরিত্যাগ করা সহজ নয়, তাই শিক্ষানবীশ ধীরে ধীরে বহুত্বের পৃথিবীর ফাঁদগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং সতকর্তার সাথে বস্তুজগত থেকে তার সফর শুরু করে।

শীঘ্রই আরেকটি পৃথিবীতে সে প্রবেশ করে যাকে বলা হয় 'বারযাখ'। এটি হলো তার শয়তানী আকাঙ্ক্ষা ও ভেতরের ভাবনাসমূহের পৃথিবী। এখানে সে দেখে যে বস্তুগত সম্পর্ক তার হৃদয়ে অনেক অপবিত্রতা জমা করেছে। তার

ইন্দ্রিয়জাত লালসা ও কামনা-বাসনার ফসল এ অপবিত্রতাগুলো আসলে তার বস্তুগত সম্পর্কেরই একটি শাখা। এ চিন্তাগুলো শিক্ষানবীশকে তার আধ্যাত্মিক সফরে বাধা দেয়, ফলে সে মানসিক শান্তি হারায়। সে কিছু সময় আল্লাহকে স্মরণ করে আনন্দ পেতে চায়, কিন্তু এ চিন্তাগুলো হঠাৎ করেই তাকে বাধা দেয় এবং তার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

একজন আলেম ভালোই বলেছেন যে, মানুষ সব সময়ই ফালতু চিন্তায় ডুবে থাকে এবং লাভ লোকসানের চিন্তা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এর ফলে সে তার স্থিরতা ও মানসিক শান্তিই শুধু হারায় না, অধিকন্তু উচ্চতর জগতের দিকে তার আধ্যাত্মিক সফরের বিষয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। এটি পরিষ্কার যে, মানসিক অস্থিরতা যে কোন শারীরিক ক্ষতি ও ব্যথার চেয়ে ক্ষতিকর। মানুষ বাহ্যিক সম্পর্ক ও আগ্রহসমূহের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে পারে কিন্তু তার নিজের ধারণা ও চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়া কঠিন, কারণ তারা সব সময় তার সাথেই আছে।

যাহোক, আল্লাহ্‌কে সত্যিকারভাবে সন্ধানকারী এবং তাঁর পথে ভ্রমণকারী এসব বাধায় বিপর্যস্ত ও অনুৎসাহিত হয়ে পড়ে না, বরং তার গন্তব্যস্থলে সে সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে থাকে তার ঐশী দমকা বাতাসের (*জযবা*) সাহায্যে ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না সে বারযাখ নামের এ সংকীর্ণ ও পরস্পর বিরোধী পৃথিবী থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসে। তাকে খুবই সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে যে কোন ভয়ঙ্কর চিন্তার বিরুদ্ধে, যা তখনও তার মনের কোন লুকোনো স্থানে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে।

যখন এ ভয়ঙ্কর চিন্তাগুলোকে বের করা হয় তখন তারা সাধারণত মনের গোপন কোণে লুকিয়ে থাকে। বেচারা ভুল করে ভাবে সে এদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু যখনই সে জীবন ঝর্ণাতে পৌঁছাবার পথ পেয়ে যায় এবং তা থেকে পান করতে উদ্যত হয় তখন হঠাৎ করেই তারা আবার উপস্থিত হয় তাকে ধ্বংস করে দিতে। এ সালিককে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় যে তার বাসায় একটি পানির 'হাওয' তৈরী করেছে কিন্তু সে অনেক দিন ধরে তা ব্যবহার করেনি। ফলে অপবিত্রতা ও দুষণ তলায় জমা হয়েছে যদিও উপর থেকে তা পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে। সে মনে করে এ পানি পরিষ্কার কিন্তু যখন সে 'হাওযে' নামে অথবা তাতে কিছু ধোয় তখন কালো ময়লার দলাগুলো এর উপরিভাগে ভেসে উঠে এবং সে পানিকে ময়লা দেখতে পায়।

এজন্য সালিক বা আধ্যাত্মিক যাত্রীর প্রয়োজন রিয়াযাত ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মনোযোগকে ধরে রাখা যেন তা আল্লাহর দিক থেকে সরে না যায়। সব শেষে বারযাখ পেরিয়ে সালিক আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে। এখনও তাকে বেশ ক'টি ধাপ অতিক্রম করতে হবে যা বিস্তারিতভাবে আমরা পরে আলোচনা করবো।

সংক্ষেপে বলা যায়, সালিক নিজের নীচসত্তা এবং আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতসমূহ লক্ষ্য করার মাধ্যমে এগিয়ে যায় ঐ পর্যন্ত যখন সে সম্পূর্ণ বিলীন (ফানা)-এর স্তরে পৌঁছে যায় অর্থাৎ নিজের বিলীনযোগ্য ইচ্ছা থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর রয়েছে 'বাক্বা'-র মাক্বাম (আল্লাহর চিরস্থায়ী ইচ্ছার ভিতরে বসবাস), এটি হচ্ছে সেই স্তর যেখানে চিরস্থায়ী জীবনের রহস্যটি তার কাছে প্রকাশ করা হয়।

আমরা এ বিশ্বাসটিকে কোরআন থেকে অনুধাবন করতে পারি যদি আমরা এর কিছু নির্দিষ্ট আয়াতের উপর গভীরভাবে ভাবি ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء

عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿﴾

"ভেবোনা যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তারা মৃত, না, তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সাথেই আছে এবং রিয্‌ক প্রাপ্ত।" (সূরা ইমরান ঃ ১৬৯)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ...﴿﴾

"সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু তাঁর সূরত ছাড়া"। (সূরা ক্বাসাস ঃ ৮৮)

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ ...﴿﴾

"যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাথে যা আছে তা থাকবে।" (সূরা নাহল ঃ ৯৬)

এ আয়াতগুলোকে একত্র করলে দেখা যায় যে, আল্লাহর সূরত হচ্ছে তারা "যারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের সাথেই আছে এবং রিযক প্রাপ্ত"। কোরআনের কথা অনুযায়ী তারা কখনও ধ্বংস হবে না। অন্যান্য আয়াত ইঙ্গিত করে আল্লাহর সূরত বলতে আল্লাহর নামকে বোঝায় যা কখনও ধ্বংস হবে না।

একটি আয়াতে কোরআন নিজেই আল্লাহর সূরতকে ব্যাখ্যা করেছে যে, তা হলো আল্লাহর নামসমূহ এবং আল্লাহর সূরতকে উল্লেখ করেছে গৌরব ও সম্মান বলে :

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ﴿﴾

"প্রত্যেকেই যারা বেঁচে আছে বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু থাকবে তোমার প্রতিপালকের গৌরব ও সম্মানের সূরত।" (সূরা আর-রাহমান ঃ ২৭)

কোরআনের সব তাফসীরকারক একমত যে, এ আয়াতের শব্দ সমষ্টি "গৌরব ও সম্মান" আল্লাহর সূরতকেই বর্ণনা করে। যেহেতু আমরা জানি সবকিছুর সূরত হচ্ছে তা যা তাকে প্রকাশ করে। আল্লাহর প্রকাশ হচ্ছে তার নাম ও গুণাবলী। এগুলো হচ্ছে তারা যাদের মাধ্যমে সৃষ্টি জগত আল্লাহর দিকে তাকায়। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, তাঁকে জানতে পারে। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে, প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তু বিলীন হয়ে যায় এবং ক্ষয়ে যায়, কেবল আল্লাহর গৌরবময় সুন্দর নামসমূহ ছাড়া। এটি আরো দেখায় যে, সাধকরা যাদের প্রতি এ আয়াত প্রযোজ্য হয় - "না তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সাথেই আছে এবং তারা রিয্‌ক প্রাপ্ত" তারা আল্লাহর গৌরবময় ও সুন্দর নামের প্রকাশ।

উপরের কথা থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইমামরা কী বুঝিয়েছিলেন যখন তারা বলেছিলেন ঃ "আমরা আল্লাহর নামসমূহ"। পরিষ্কার ভাবেই কোন সরকার প্রধান বা কোন ধর্মীয় আইনগত প্রধানের পদটি তা নয় যা শব্দগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ কথাগুলো আসলে যা বোঝায় তা হচ্ছে, আল্লাহতে ফানা হয়ে যাবার অবস্থা এবং সেখানেই আল্লাহর সূরতের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং তার গৌরবময় সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলীর প্রকাশ হয়ে অবস্থান করা। আধ্যাত্মিক সফরের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে মুরাক্বাবাহ (পর্যালোচনামূলক ধ্যান)। এটি জরুরী যে

সালিক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন স্তরেই মোরাক্বাবাহ্ উপেক্ষা করবে না। এটি বুঝতে হবে যে মোরাক্বাবাহর অনেক ধাপ ও অনেক রকম রয়েছে। শুরুতে সালিককে এক ধরনের মুরাক্বাবাহ করতে হয় এবং পরের স্তরগুলোতে আরেক ধরনের। সালিক যতই সামনে এগোয় তার মোরাক্বাবাহ এত শক্তিশালী হয় যে যদি কখনো একজন নুতন লোক তা করতে শুরু করে তাহলে হয় সে তা ছেড়ে দিবে অথবা পাগল হয়ে যাবে। তবে প্রাথমিক স্তরগুলো সফলতার সাথে সম্পন্ন করে সালিক মোরাক্বাবাহর উচ্চতর স্তরগুলো গ্রহণে সক্ষম হয়। এ সময় অনেক জিনিস যা তার জন্য শুরুতে হালাল ছিল তা হারাম হয়ে যায়। সতর্কতা ও অধ্যাবসায়ের সাথে মোরাক্বাবাহর ফলে প্রেমের আগুনের একটি শিখা সালিকের অন্তরে দেখা দেয়, কারণ মানুষের ভেতর জন্ম থেকেই পরম সুন্দর ও নিখুঁত এর প্রতি প্রেম রয়েছে। কিন্তু বস্তুর প্রতি লোভ এ জন্মগত প্রেমকে ঢেকে ফেলে এবং একে বড় ও দৃশ্যমান হতে দেয় না।

মোরাক্বাবাহ এ পর্দাকে দুর্বল করে ফেলে এবং এক পর্যায়ে তা পুরোপুরিই উঠে যায়। তখন ঐ জন্মগত প্রেম তার পূর্ণ জ্যোতিসহ উপস্থিত হয় এবং মানুষের বিবেককে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। আধ্যাত্মিক কবিরা প্রায়ই এ ঐশী প্রেমকে 'সুরা' বলে থাকেন।

যখন সালিক দীর্ঘ একটি সময়ের জন্য মোরাক্বাবাহ চালিয়ে যেতে থাকে তখন ঐশী আলো তার কাছে দৃশ্যমান হয়। প্রথম দিকে মুহূর্তের জন্য এগুলো বিদ্যুতের মত চমকায় এবং চলে যায়। ধীরে ধীরে ঐশী আলো শক্তিশালী হতে থাকে এবং ছোট ছোট তারার মত উপস্থিত হয়। যখন এগুলো আরো বড় হয় প্রথমে তা চাঁদের মত উপস্থিত হয় এবং এরপর সূর্যের মত। কোন কোন সময় তা একটি জ্বলন্ত বাতির মতও উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক ভাষায় এ আলোগুলোকে ইরফানী ঘুম বলা হয় এবং এগুলো হচ্ছে বারযাখীয় পৃথিবীর একটি অংশ।

যখন সালিক এ স্তর অতিক্রম করে এবং তার মোরাক্বাবাহ শক্তিশালী হয় সে দেখে যেন আসমান ও জমিন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরোটিই আলোকিত হয়ে আছে। এ আলোকে বলা হয় 'নিজেরই আলো'। আর এটি দেখা যায় যখন সাধক বারযাখের দুনিয়া অতিক্রম করে যায়। বারযাখীয় পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসার পর নিজের প্রাথমিক প্রকাশগুলো শুরু হয়। সালিক নিজেকে বস্তুগত আকারে দেখতে পায়। সে প্রায়ই অনুভব করে যে সে নিজের

পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। এ স্তরটি হলো নিজের আবরণ খুলে ফেলার প্রাথমিক স্তর।

আল্লামা মির্যা আলী ক্বাযী বলতেন, একদিন যখন তিনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন তখন হঠাৎ করেই দেখলেন যে, তিনি চুপচাপ নিজের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। যখন তিনি ভালো করে তাকালেন দেখলেন তার চেহারায় চামড়া ও গোশত বলে কিছুই নেই। তিনি তার ঘরে চলে গেলেন ও আয়নায় তাকালেন। তিনি দেখলেন তার চেহারা খালি যেন কোন কালেই তাতে কিছু ছিলো না।

কিছু কিছু সময় এমন হয় যে সাধক অনুভব করেন তার কোন অস্তিত্বই নেই। তিনি নিজেকে খুঁজে পেতে চান, কিন্তু সফল হন না। এগুলো হচ্ছে নিজেকে খুলে ফেলার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণসমূহ। কিন্তু এগুলো সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার বাইরে নয়। এর পরের স্তরে আল্লাহ্‌র সাহায্যে সালিক এসব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে এবং নিজের সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে দেখতে পায়। জানা যায় মির্যা জাওয়াদ মালিকী তাবরিযী পুরো চৌদ্দ বছর আখুন্দ মোল্লা হুসেইন কুলী হামাদানীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং ইরফান (আধ্যাত্মিক) শাস্ত্রে তার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

একদিন আমার উস্তাদ আমাকে তার এক ছাত্র সম্পর্কে বললেন যে তখন থেকে ঐ ছাত্রের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব আমার। সে ছয় বছর নিজেকে মোরাক্বাবাহ ও আত্মশুদ্ধিতে ব্যস্ত রাখলো। শেষে সে নিজেকে জানার ধাপে পৌঁছালো এবং তার শয়তানী সত্তা বিদূরিত হলো। আমি ভাবলাম এটিই সঠিক হবে যে, আমার উস্তাদ তাকে এ বাস্তবতা সম্পর্কে বলুক। অতএব আমি তাকে আমার উস্তাদের বাসায় নিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম আমি কি চাই। আমার উস্তাদ বললেন "এটি কিছু নয়" এবং একই সময় তিনি হাত ইশারা করলেন এবং বললেন "এটিকে বলে আবরণ খোলা"। ঐ ছাত্রটি বলতো "আমি দেখলাম আমার শরীর থেকে আমাকে খুলে ফেলা হয়েছে এবং একই সময় আমি অনুভব করলাম আরেকজন মানুষ একেবারে আমারই মত আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।"

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে বারযাখীয় পৃথিবীতে যা দেখা যায় তা তুলনামূলক ভাবে কম। এটি বেশি প্রয়োজন যে, কোন ব্যক্তি

নিজেকে সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত অবস্থায় দেখবে। কারণ এ অবস্থায় মানুষ সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা মুক্ত অবস্থায় নিখাঁদ বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত হয়। আগের ধাপগুলোতে পর্যবেক্ষণগুলো ছিল প্রাথমিক ও আংশিক এবং এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

মরহুম আখুন্দ সাহেবের আরেকজন সুপরিচিত ছাত্র আগা সাইয়্যেদ আহমদ কারবালাঈ বলেন: "একদিন আমি কোথাও ঘুমিয়েছিলাম এমন সময় হঠাৎ কেউ একজন আমাকে জাগ্রত করলেন এবং বললেন: এখনি ওঠো যদি তুমি চিরস্থায়ী আলো দেখতে চাও। আমি আমার চোখ খুললাম এবং দেখলাম একটি উজ্জ্বল আলো সব জায়গায় এবং সবদিকে জ্বলছে"। এটি হচ্ছে নিজে আলোকিত হওয়ার স্তর। যা একটি সীমাহীন আলো হিসাবে উপস্থিত হয়।

যখন সৌভাগ্যবান সালিক এ স্তর অতিক্রম করে যায়, তখন সে অন্যান্য স্তরগুলো ঐ গতিতে অতিক্রম করে যা মোরাক্বাবাহর প্রতি তার মনোযোগের সাথে সংগতিপূর্ণ। সে আল্লাহর গুণাবলী অথবা আল্লাহর নামসমূহ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেগুলোকে পরম গুণাবলী হিসাবে দেখে। এ সময় সে হঠাৎ করেই অনুভব করে যে, সমস্ত অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহ জ্ঞানের একটি ইউনিট এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। এটি হচ্ছে খোদায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহ অবলোকনের স্তর। এটি খোদায়ী নামসমূহ অবলোকনের স্তরের চাইতেও উপরে। এ স্তরে সাধক দেখতে পায় সমস্ত জগতে শুধু একজনই সর্বজ্ঞ, সবকিছু করতে সক্ষম এবং তিনি জীবিত অস্তিত্বে রয়েছেন। এ স্তরটি খোদায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সচেতন হবার স্তর থেকে অনেক অনেক উপরে। এটি একটি অবস্থা যা ক্বলবে উপস্থিত হয়। এ সময় সালিক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সর্বজ্ঞ, শক্তিশালী এবং জীবিত হিসাবে দেখতে পায় না। এ স্তরের অবলোকন আসে সাধারণত: কোরআন তেলাওয়াতের সময় যখন তেলাওয়াতকারী অনুভব করে সে নয় অন্য কেউ কোরআন তেলাওয়াত করছে। মাঝে মাঝে সে অনুভব করে অন্য আরেকজন রয়েছেন যিনি তার তেলাওয়াত শুনছেন।

এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোরআন তেলাওয়াত এ অবস্থা আনতে খুবই কার্যকরী। সাধকের উচিত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া এবং ঐ সূরাগুলো তেলাওয়াত করা যেগুলোতে সিজদা দেয়া বাধ্যতামূলক। যেমন, সূরা সাজদা,

সূরা হামীম-সাজদাহ, সূরা নাজম এবং সূরা আলাক্ব। কেননা সূরা পড়ার সময় সিজদা করা অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় বৃহস্পতিবার রাতের ইবাদতে এ উদ্দেশ্যে সূরা সাদ তেলাওয়াত খুবই কার্যকরী। এ সূরার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীসে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

যখন সাধক এ সব স্তরও অবলোকন সম্পন্ন করে, তখন সে ঐশী দমকা বাতাসে (জযবা) ঘেরাও হয়ে যায় এবং প্রতি মুহূর্তেই সে প্রকৃত ফানাহ-র পর্যায়ের নিকটবর্তী হতে থাকে। এক সময় সে ঐশী দমকা বাতাসের কারণে মাশুকের ('প্রকৃত প্রেমাস্পদের') সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতায় ডুবে যায়। সে আর নিজের প্রতি বা আর কারো প্রতি কোন মনোযোগই দেয় না। আল্লাহকে সে সব জায়গাতেই দেখতে পায়।

"সেখানে ছিলেন আল্লাহ এবং তাঁর সাথে কিছুই ছিলো না।"

এ অবস্থায় সাধক খোদায়ী দৃশ্যের অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়।

এটিও মনে রাখা দরকার যে, এর মানে এ নয় যে বস্তুজগতের সবকিছু তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আসলে সাধক বহুত্বের ভেতর একত্ব দেখতে পায়। আসলে সবকিছুই আগের মতই অস্তিত্বশীল থাকে। একজন আধ্যাত্মিক সাধক বলেছেন: "আমি মানুষের মাঝে ত্রিশ বছর ছিলাম। তারা ভাবতো যে, আমি তাদের সব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছি, অথচ এ পুরো সময়টিই আমি তাদের দেখতে পাইনি এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেই জানতাম না।" এ অবস্থাটি প্রকাশ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে শুরুতে তা একটি মুহূর্তের জন্য ঘটতে পারে, কিন্তু ক্রমেই এর স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত হতে থাকে। প্রথমে তা দশ মিনিট থাকতে পারে, তারপর এক ঘন্টা এবং এরপর আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য। এ হাল আল্লাহর অনুগ্রহে স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।

আধ্যাত্মিক সাধকদের ভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় "বাক্বাবিল্লাহ (আল্লাহ্র ভেতরে বসবাস" অথবা "আল্লাহর ভেতরে চিরস্থায়ী জীবন")। মানুষ এ অবস্থায় উপনীত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজ সত্তা থেকে বিলীন হয়ে যায়। এ মাক্বামে উপস্থিত হলে সাধক আল্লাহকে ছাড়া আর কিছুই দেখে না।

বলা হয় খোদা প্রেমে নিমজ্জিত এক সূফী ছিলেন যার উপরে এসেছিলো ঐশী দমকা বাতাস। তার নাম ছিলো বাবা ফারাজুল্লাহ। মানুষ তাকে বললো পৃথিবী সম্পর্কে কিছু বলতে। তিনি বললেন: "আমি এর সম্পর্কে কী বলতে পারি ? আমার জন্ম থেকেই আমি কোনদিন একে দেখিনি"।

শুরুতে যখন অবলোকন দুর্বল থাকে তখন তাকে 'হাল' বলা হয় এবং এর আগমন সাধকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। কিন্তু নিয়মিত মোরাক্বাবাহর ফলে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে এ হাল স্থায়ী একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলে একে বলা হয় মাক্বাম। তখন অবলোকনের অবস্থা সাধক বা সালিকের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

সুস্পষ্টভাবেই একজন শক্তিশালী সালিক হলো সে, যে এ হালগুলো পর্যবেক্ষণের সাথে বহুত্বের পৃথিবীর দিকেও দৃষ্টি রাখে এবং একত্বের পৃথিবীর সাথে সাথে বহুত্বের পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক ভাল করেই ধরে রাখে। এটি অত্যন্ত উঁচু স্তর এবং তা সহজে অর্জন করা যায় না। সম্ভবত এ মাক্বামটি নবীদের জন্য এবং আরো কিছু বিশেষভাবে নির্বাচিত আল্লাহর বিশেষ প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে যারা বলতে পারে: "আমার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের অবস্থা হলো এই যে, সবচেয়ে প্রিয় ফেরেশতাও তা অর্জনে অক্ষম এবং একই সময়ে বলতে পারেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ"।

কেউ হয়তো বলতে পারে যে শুধুমাত্র নবীরা ও ইমামরাই এ উঁচু স্থানগুলোতে পৌঁছুতে সক্ষম। কিভাবে অন্যদের পক্ষে তা অর্জন সম্ভব? আমাদের উত্তর হচ্ছে, নবুয়ত ও ইমামত হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে বিশেষ নিয়োগ প্রাপ্ত পদ যেখানে অন্যরা পৌঁছুতে পারে না, কিন্তু 'পরম একত্বের' মাক্বাম ও আল্লাহর ভেতরে ফানা হয়ে যাওয়া, যাকে বলা হয় বেলায়েত তা শুধু নবীগণ ও ইমামদের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা নয়। কারণ তারা নিজেরাই তাদের অনুগামীদের আহবান করেছেন সম্পূর্ণতার এ মাক্বামে পৌঁছুবার জন্য। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর উম্মতকে (মুসলিম জাতি) তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেছেন। এটি তাই প্রমাণ করে যে, অন্যদের জন্যও সম্ভব এ জায়গায় পৌঁছানো। তা না হলে এ ধরনের নির্দেশের কোন অর্থই থাকতো না।

কোরআন বলে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ

يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ﴿﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা তার জন্য, যে আল্লাহর দিকে ও আখেরাতের দিকে রুজু করে এবং আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব ঃ ২১)

আহ্‌লে সুন্নাতের কিতাবে একটি হাদীস রয়েছে, একবার রাসুল (সাঃ) বললেন, "তোমরা যদি বাচাল এবং অস্থিরচিত্ত না হতে তাহলে তোমরা তাই দেখতে পেতে যা আমি দেখি এবং তা শুনতে পেতে যা আমি শুনি।"

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, মনুষত্বের পূর্ণতায় না পৌঁছাতে পারার প্রকৃত কারণ হচ্ছে শয়তানী চিন্তা ও অন্যায় কার্যকলাপ। শিয়া উৎস থেকে আসা একটি হাদীস অনুযায়ী নবী (সাঃ) বলেছেন, "শয়তানরা যদি তাদের ক্বলবের চারদিকে ঘুরে না বেড়াতো তাহলে মানুষ আসমান ও জমিনের পূর্ণ রাজ্যটি দেখতে পেতো।" মানুষের এ উচ্চ মর্যাদার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ উচ্চতা ধারণ করে তা ঐশী রাজত্বকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী বুঝতে সাহায্য করে। সে বিশ্বজগতের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক জিনিসের উপর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।

বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক শেখ আব্দুল কারীম আল জিলি তার 'ইনসানে কামেল' বইতে লিখেছেন যে একবার তার এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, তিনি অনুভব করলেন তিনি সব অস্তিত্বশীল জিনিসের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন এবং সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। এ অবস্থা এক মুহূর্তের বেশী স্থায়ী ছিল না।

স্পষ্টতঃই সাধকের শারিরীক প্রয়োজনের দিকে মনোযোগের কারণেই এ অবস্থা দীর্ঘ হয় না।

একজন সুপরিচিত সূফী বলেন মানুষ তার মৃত্যুর পাঁচশ' বছর পর তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের শেষ চিহ্নটুকু থেকে মুক্ত হয়। এ সময়টি ঐশী দিনের অর্ধেক সময়ের সমান। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿﴾

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছে একদিন তোমাদের হিসাবে এক হাজার বছর"। (সূরা হজ্ব ঃ ৪৭)

এটি স্পষ্ট যে পরবর্তী পৃথিবীর অনুগ্রহ ও ঐশী দানসমূহ অসংখ্য ও সীমাহীন। সেগুলো বর্ণনা করতে মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে শব্দ চয়ন করা হয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজনের বিস্তৃতির সাথে সাথে নুতন নুতন শব্দের চয়ন ঘটছে। এজন্য সব ঐশী সত্য ও উপহার ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যা বলা হয়েছে তা রূপক ও উদাহরণ স্বরূপ। উচ্চতর সত্যগুলো ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। বলা হয়েছে যে,

"তোমরা অন্ধকারতম পৃথিবীতে আছো।"

এ হাদীস অনুযায়ী মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীসমূহের অন্ধকারতমটিতে বসবাস করছে।

মানুষ শব্দ চয়ন করে তার প্রয়োজন মেটাতে এবং বস্তুজগতের যা সে দেখে ও অনুভব করে তার উপর ভিত্তি করে। অন্য পৃথিবীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, নেয়ামতসমূহ ও রূহগুলো সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই নেই এবং তাই সে সেগুলো বর্ণনায় কোন শব্দ চয়ন করতে পারে না। এজন্যই এ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই যথাযথ শব্দ নেই যা উচ্চতর সত্যসমূহ ও ধারণাসমূহ প্রকাশ করবে। যখন আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং আমাদের চিন্তা ত্রুটিপূর্ণ এ সমস্যাটির সমাধান তখন কিভাবে সম্ভব?

উচ্চতর সত্যগুলো সম্পর্কে দুটো দল কথা বলেছে। প্রথম দলটি হচ্ছেন নবীরা। তাদের আছে অবস্তুজগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ, কিন্তু তারা আরও বলেন ঃ

"আমরা নবীরা আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি সাধারণ লোকদের সাথে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতে।"

এর অর্থ হলো তারা বাধ্য হয়েছেন সত্যগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করতে যা সাধারণ লোকদের কাছে বোধগম্য। অতএব, তারা আধ্যাত্মিক আলোসমূহের প্রকৃতি ও তাদের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনা করা এড়িয়ে গেছেন। তারা সেসব সত্যসমূহ সম্পর্কে কথা বলেননি যা মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। তারা শুধু এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন, বেহেশত, হুরী এবং প্রাসাদসমূহ, কারণ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"কোন চোখ তা দেখেনি, না কোন কান তা শুনেছে এবং কেউ তা চিন্তাও করেনি।" তারা এও স্বীকার করেছেন যে অন্যান্য জগতের সত্যগুলো বর্ণনা করা অসম্ভব ব্যপার।

দ্বিতীয় দলটি হচ্ছেন তারা যারা নবীদের দেখানো পথে এগিয়ে যান এবং তাদের ক্ষমতানুযায়ী সত্যগুলো উপলব্ধি করেন। তারাও একটি উদাহরণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

সাধনায় আন্তরিকতা ঃ

এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে আল্লাহর পথে আন্তরিক হওয়া ছাড়া আধ্যাত্মিক মাক্বাম ও স্তর অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যসমূহকে সালিকের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, যদি সে সম্পূর্ণ আন্তরিক ও তার সাধনায় একাগ্রচিত্ত না হয়।

আন্তরিকতার দুটো স্তর রয়েছে। **প্রথম স্তরটি** হচ্ছে শুধু আল্লাহর জন্যে সমস্ত ধর্মীয় আদেশগুলো মেনে চলা। **দ্বিতীয় স্তরটি** হচ্ছে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিয়োজিত করবে। প্রথম স্তরটি এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...﴿﴾

"তাদেরকে অন্য কোন আদেশ দেয়া হয় নি, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা ছাড়া এবং একমাত্র তারই আনুগত্য করা ছাড়া।" (সূরা আল বাইয়্যিনাহ ঃ ৫)

দ্বিতীয় স্তরটি নিচের আয়াতটি দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿﴾

"একমাত্র আল্লাহর একাগ্রচিত্ত দাস ছাড়া।" (সূরা সাফফাত ঃ ১২৮)

নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে একটি সুপরিচিত হাদীস রয়েছে যে, "যদি কোন ব্যক্তি ৪০ দিনের জন্য নিজেকে আল্লাহর জন্য নিয়োজিত রাখে তাহলে প্রজ্ঞার ঝর্ণা বয় তার হৃদয় থেকে জিহবায়।" এ হাদিসটি দ্বিতীয় স্তরের আন্তরিকতার দিকে ইঙ্গিত করে।

কোরআন বিভিন্ন জায়গায় একটি কাজকে সালিহ (ধার্মিক ও নৈতিক) বলে বর্ণনা করেছে। যেমনটি বলা হয়েছে ঃ "যে-ই একটি সালিহ কাজ করলো।" এবং অন্য কিছু জায়গায় কিছু মানুষকে তা সালিহ হিসাবে বর্ণনা করেছে। উদাহরণস্বরূপ এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "অবশ্যই সে ছিলো সালিহদের (ধার্মিক) অন্তর্ভুক্ত"। একই ভাবে কোন কোন সময় তা একটি কাজকে আন্তরিক বলে বর্ণনা করেছে এবং কোন কোন সময় একজন মানুষকে আন্তরিক বলেছে। এটি পরিষ্কার যে মানুষের আন্তরিকতা তার কাজের উপর নির্ভর করে এবং সে আন্তরিক হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার সমস্ত কাজেই আন্তরিক হয় এবং সে যা করে ও বলে তার সবটিতে আন্তরিক হয়।

আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ...﴾

"তাঁরই দিকে ভালো কথা উপরে উঠে এবং ভালো কাজ তাকে উপরে উঠায়।"

(সূরা ফাতির ঃ ১০)

মনে রাখা দরকার একজন মানুষ, যে ব্যক্তিগত আন্তরিকতার স্তর অর্জন করে, সে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পন্ন হয় যা অন্যরা ধারণ করে না।

গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্য সে অর্জন করে তা হচ্ছে, কোরআনের একটি বক্তব্য অনুযায়ী, সে শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকে। কোরআন শয়তানের কথা উদ্ধৃত করেছে ঃ

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ • إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾

"সে বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার মর্যাদার কসম দিই, আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো, শুধু তারা ছাড়া যারা আপনার একাগ্রচিত্ত দাস"।

(সূরা সাদ ঃ ৮২-৮৩)

এখানে এটি স্পষ্ট যে আল্লাহর একাগ্রচিত্ত দাসেরা এ থেকে মুক্ত। কিন্তু তা এজন্য নয় যে শয়তানকে আল্লাহ তা করতে বাধ্য করেছেন। বরং তারা এ থেকে বাদ পড়েছে, কেননা তারা একত্বের মাক্বাম অর্জন করতে পেরেছে। শয়তান তাদের উপর আর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম নয়। যেহেতু তারা নিজেদেরকে শুধুই আল্লাহর জন্য প্রস্তুত করেছে তাই তারা যে দিকে তাকায় সে দিকেই আল্লাহকে দেখে। শয়তান যে আকারই ধারণ করুক না কেন তারা এর ভেতর আল্লাহর গৌরবেরই প্রকাশ দেখতে পায়। তাই শয়তান শুরুতেই এদের বিরুদ্ধে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে। আর তারতো কাজ এটিই যে সে আদমের সন্তানদেরকে লোভ দেখাবে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। সে কারো উপরেই দয়া করতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর একাগ্রচিত্ত দাসদের বিচার দিনে কোন হিসাব নিকাশ দিতে হবে না। কোরআন বলে ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ

إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ ... ﴾

"শিঙ্গা বাজানো হবে এবং আসমানগুলোতে ও জমিনে যারা আছে সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে, তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ চান।" (সূরা যুমার ঃ ৬৮)

এ আয়াত স্পষ্টভাবে দেখায় যে একটি নামবিহীন দল বিচার দিনের ভয় থেকে মুক্ত থাকবে। আমরা যখন এ আয়াতকে অন্য একটি আয়াতের সাথে মিলাই যেটি বলে ঃ

فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ • إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾

"তাদের অবশ্যই উপস্থিত করা হবে শুধু একাগ্রচিত্তরা ছাড়া।"

(সূরা সাফফাত ঃ ১২৭-১২৮)

ফলে এটি পরিস্কার হয়ে যায় কোন দলটি। একাগ্রচিত্ত দলটিকে হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হবে না। তারা ইতোমধ্যেই চিরজীবন লাভ করেছে তাদের মোরাক্বাবাহ, ফানাহ হওয়া ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে। তারা ইতোমধ্যেই হিসাব ও বিচার অতিক্রম করেছে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়ে, "তারা তাদের প্রতিপালকের সাথেই আছে এবং রিয্ক প্রাপ্ত"।

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ

أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿﴾

"ভেবো না যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তারা মৃত, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সাথেই আছে এবং রিযক প্রাপ্ত।"

(সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯)

বরং তাদেরকেই উপস্থিত করা হবে যারা উপস্থিত নেই। এ ব্যক্তিগণ পুনরুত্থান দিবসের আগেই উপস্থিত হয়ে আছেন, কারণ আল্লাহ বলছেন, "তারা তাদের প্রতিপালকের সাথেই আছে ও রিয্ক প্রাপ্ত।"

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে বিচার দিনে লোকদেরকে পুরষ্কার ও ক্ষতিপুরণ দেয়া হবে তাদের কাজ অনুযায়ী, কিন্তু একাগ্রচিত্ত লোকেরা তাদের কাজ অতিক্রম করে পুরষ্কার লাভ করবে ঃ

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ • إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿﴾

"এবং তোমারা যা করছো তারই প্রতিফল পাবে, শুধু আল্লাহর একাগ্রচিত্ত দাসরা ছাড়া।" (সূরা সাফফাত ঃ ৩৯-৪০)

যদি দাবী করা হয় এ আয়াতটি এটিই বোঝায় যে, একমাত্র গুনাহ্গাররা তাদের গুনাহর কারণে শাস্তি পাবে এবং ধার্মিকদের যে পুরষ্কার দেয়া হবে তা হবে আল্লাহর কাছ থেকে শুধুই অনুগ্রহ তাহলে আমরা বলবো এ আয়াতের ভঙ্গিতে সাধারণ ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তা শুধু গুনাহগারদের দিকে

ইঙ্গিত করে না। অধিকন্তু, আল্লাহর অনুদান ও পুরষ্কারের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা নেই। কেননা আল্লাহর অনুদান বলতে তাই বোঝায় যে, আল্লাহ ছোট কোন কাজের জন্য বিরাট পুরষ্কার দিয়ে থাকেন। এরকম অনুদান থাকা সত্ত্বেও বড় কাজের জন্যও পুরষ্কার রয়েছে। কিন্তু এ আয়াত যা বলছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এটি বলছে আল্লাহর একাগ্রচিত্ত দাসদের ওপর আল্লাহ যা দেবেন তা হচ্ছে বিশুদ্ধ অনুদান। কোন কাজের জন্য কোন পুরষ্কার নয়।

আরেকটি আয়াত বলছে ঃ

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿﴾

"তারা সেখানে তাই পাবে যা তারা চাইবে এবং আমাদের কাছে আরও রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৫)

এর অর্থ হচ্ছে বেহেশতের বাসিন্দারা সবই পাবে যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে অথবা চাইবে। শুধু তাই নয় আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন যা তারা কল্পনা ও চিন্তাও করতে পারে না। এটি ভাবার মত বিষয়।

চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে এ দলটি এমন এক উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে যে এর সদস্যরা আল্লাহর প্রশংসা যথাযথভাবে করতে পারে।

আল্লাহ বলেন ঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ • إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿﴾

"আল্লাহই প্রশংসিত, তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। শুধুমাত্র আল্লাহর একাগ্রচিত্ত দাসরা তার সম্পর্কে যা বলে তা ছাড়া।"

(সূরা সাফফাত ঃ ১৫৯-১৬০)

এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ স্থান যা একজন মানুষ অর্জন করতে পারে।

উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় আধ্যাত্মিকতার শেষ স্তরে আল্লাহর নেয়ামত সমূহ কী। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ নেয়ামতগুলো তখনই সালিক লাভ করতে পারে যখন সালিকের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা তাকে আত্মসত্তা বিলীন এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়; যখন তাকে বলা যেতে পারে যে সে আল্লাহর রাস্তায় নিহত

হয়েছে এবং শহীদদের জন্য যে পুরস্কার রাখা হয়েছে সে তা লাভের যোগ্য হতে পারে। ঠিক যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি তরবারী একজন শহীদের দেহ ও আত্মার যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, একই ভাবে একজন সালিক তার দেহ ও আত্মার যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তার ক্ষুধার্ত নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর এ কাজে সে তার শারীরিক শক্তির বদলে আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্য নেয়।

একজন সাধকের উচিত তার আধ্যাত্মিক যাত্রার শুরুতে দরবেশী জীবন যাপন করা এবং সবসময় এ পৃথিবীর মূল্যহীন অহংবোধের বিরুদ্ধে মনোযোগ ধরে রাখা। আর এভাবেই বহুত্বের এ পৃথিবীর সাথে সে তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যখন সে এ পৃথিবীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে তখন কোন বৈষয়িক লাভ তাকে আনন্দিত করবে না এবং কোন বৈষয়িক ক্ষতিও তাকে দুঃখিত করবে না।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ...﴾

"যেন তোমরা যা হারিয়েছো তা নিয়ে দুঃখ না করো এবং তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে গর্বিত না হও।" (সূরা হাদিদ ঃ ২৩)

সুখ ও দুঃখের প্রতি উদাসীনতা এটি বোঝায় না যে সালিক আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে আনন্দবোধ করবে না অথবা তাকে দুর্দশাগ্রস্ত করবে এমন কিছুতে দুঃখবোধ করবে না, কারণ আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে সুখবোধ পৃথিবীর ছোট খাটো বিষয়গুলো, যেমন সম্পদ, পদ, মর্যাদা, খ্যাতি ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসার ফলে নয়। সে আল্লাহর নেয়ামতকে ভালোবাসে কারণ নিজেকেই আল্লাহর রহমতের ভেতর নিমজ্জিত দেখতে পায়।

এ স্তরটি অতিক্রম করার পরও আশেক অনুভব করে যে, সে নিজেকে খুব ভালোবাসে। যে রূহানী প্রচেষ্টা ও অনুশীলন সে চালিয়ে যায় তা তার নিজেকে ভালোবাসার ফল। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর। সে সব সময় নিজের জন্য অন্য কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। সে নিজে বেঁচে থাকার জন্য সবকিছু ধ্বংস করে দিতেও ইচ্ছা রাখে। তার জন্য এ প্রকৃতিগত ইচ্ছা পরিত্যাগ করা এবং নিজের স্বার্থপরতা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যতক্ষণ সে তা করবে না সে আশাও করতে পারেনা যে তার অন্তরে ঐশী আলো প্রকাশ পাবে।

অন্য কথায়, সালিক যদি নিজ স্বত্তাকে বিলীন করতে না পারে তবে সে আল্লাহর সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে। অতএব, তার জন্য প্রয়োজন যে সে প্রথমে স্বার্থপরতাকে দুর্বল করবে এবং শেষ পর্যন্ত তা ধ্বংস করবে, যেন সে যা-ই করে তা যেন বিশুদ্ধভাবে শুধু আল্লাহর জন্যই হয় এবং তার নিজের প্রতি ভালোবাসা যেন তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ভালোবাসায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা জরুরী। এ স্তর অতিক্রম করার পর সাধকের শরীরের সাথে ও অন্যান্য সব বস্তুগত বিষয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই শুধু নয় এমনকি তার আত্মার সাথেও তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এখন সে যাই করে তা আল্লাহর জন্যই করে। যদি সে তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খায় অথবা জীবনের নূন্যতম প্রয়োজনগুলো মেটায় তা সে করে শুধু এজন্যই যে তার চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদ চান সে বেঁচে থাকুক। তার সমস্ত ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে যায়। আর এজন্যই সে নিজের জন্য কোন ঐশী ক্ষমতা চায় না। সে বিশ্বাস করে কোন রকম আধ্যাত্মিক অনুশীলনের তার কোন অধিকার নেই যার মাধ্যমে সে অতীত জানবে অথবা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অনুমান করবে বা অন্যের চিন্তাগুলো পড়তে পারবে অথবা খুব অল্প সময়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করবে বা বিশ্ব জগতের নিয়মগুলোতে কোন পরিবর্তন ঘটাবে অথবা তার যৌন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে। কারণ এ ধরনের কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয় না অথবা তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ত ভক্তিও এগুলোতে উৎসাহিত করতে পারে না। এগুলো শুধু আত্মপূজা বোঝায় এবং এগুলো করা হয় ব্যক্তির লালসাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা মেটাতে, যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা স্বীকার নাও করতে পারে এবং যদিও সে দেখতে পায় আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে ভক্ত। কিন্তু নীচের এ আয়াত অনুযায়ী সে নিজের কামনা বাসনারই ইবাদাত করে -

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ...﴾

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?"

(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৩)

অতএব সালিকের উচিত এসব স্তর সতর্কতার সাথে অতিক্রম করা এবং যতটুকু সম্ভব তার অহংবোধের নিয়ন্ত্রণ নেয়া। আমরা এ বিষয়ে পরে আরো কথা বলবো।

যখন সাধক সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে, সে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং সবশেষে নিজেকে পুরোপুরিই ভুলে যায়। এখন সে প্রকৃত প্রেমাস্পদের চিরস্থায়ী ও সীমাহীন সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই দেখে না। এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এটি খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয় যে সালিক তার নিজের যৌন কামনার শয়তানী দলটির বিরুদ্ধে, লোভ, খ্যাতি, ক্ষমতা, অহংকার ও ধোঁকার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে হবে।

কামালিয়াত (সম্পূর্ণতা) অর্জন সম্ভব নয় যদি সামান্যতমও আত্মপ্রীতির চিহ্ন থেকে যায়। এজন্যই দেখা গেছে অনেক সম্মানিত ব্যক্তিও দীর্ঘ অনেক বছর নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করার পরও আধ্যাত্মিকতায় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন নি এবং তার শক্তিধর আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেছেন। এর কারণ ছিলো তার হৃদয় পুরোপুরি পবিত্র হয় নি এবং ছোট-খাটো কামনা-বাসনা তার হৃদয়ের কোণে ওঁৎপেতে ছিলো, যদিও সে মনে করেছিলো যে তার সকল শয়তানী বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যোৎপাটিত হয়েছে। ফলে পরীক্ষার সময় তার চাপা পড়ে থাকা কামনা-বাসনা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ফলে বেচারা আশেক খারাপ সময়ের ভেতর পড়ে গেছে।

নিজের নীচ সত্তার বিরুদ্ধে সফলতা আল্লাহর অনুদানের উপর নির্ভর করে এবং তার সাহায্য ছাড়া তা অর্জন সম্ভব নয়।

বলা হয় মরহুম বাহারুল উলুম একদিন খুব হাসিখুশী ছিলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ "পঁচিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পর এখন আমি আমার কাজকর্মকে ভনিতামুক্ত দেখতে পাচ্ছি।" এ ঘটনার শিক্ষা মনে রাখার মত।

মনে রাখা দরকার সালিকের উচিত আধ্যাত্মিক রাস্তা পরিক্রমণের একদম শুরু থেকে এর শেষ পর্যন্ত ইসলামী আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা। এমনকি আইন থেকে সামান্য সরে যাওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আপনি কখনো দেখেন কোন ব্যক্তি নিজেকে আধ্যাত্মিক হিসাবে দাবী করা সত্ত্বেও ইসলামী আইনের সবকিছু মেনে চলছে না এবং কঠোরভাবে ধার্মিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন নয়, তাহলে তাকেও ভন্ড হিসাবে ধরতে হবে।

কিন্তু যদি সে কোন ভুল করে এবং তার ভুলের জন্য কোন বৈধ কারণ দেখাতে পারে তাহলে তা ভিন্ন কথা।

একটি বড় মিথ্যা কথা এবং অপবাদ হলো যে, একজন ওয়ালীর (মুসলিম সিদ্ধপুরুষ) জন্য ইসলামী আইন-কানুন মানার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পবিত্র নবী (সাঃ) সকল জীবিত সত্তার উপর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন, তার পরও তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের আদর্শগুলো মেনে চলেছেন। অতএব তা একেবারেই মিথ্যা কথা যে একজন ওয়ালী আইন কানুন মানতে বাধ্য নন। যাহোক, একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করে তার সুপ্ত গুণাবলীকে পূর্ণতা দেবার জন্য। কিন্তু একজন ওয়ালী তাঁর ইবাদাত করে তার উচ্চ স্থানের জন্য তা প্রয়োজন বলে। বর্ণনা এসেছে যে, বিবি আয়শা পবিত্র নবীকে (সাঃ) বলেছেন "যখন আল্লাহ্ আপনার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ...﴿٢﴾

'যেন আল্লাহ আপনার গুনাহ ক্ষমা করে দেন যা আগে চলে গেছে এবং যা আগামীতে আসবে' (সূরা ফাতহ ঃ ২), তাহলে আপনি কেন এত পরিশ্রম করছেন ইবাদাতের জন্য?" পবিত্র নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"

এটি প্রমাণ করে কিছু কিছু ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করে তাদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ করার জন্য নয়, বরং আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

সালিক যে অবস্থাগুলোর অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং যে নূরসমূহ সে ধারণ করে তা হচ্ছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জনের পূর্বাভাস। অন্যথায় তার অবস্থার একটি সাধারণ পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। সালিক অতি অবশ্যই যেন সম্পূর্ণভাবে তার ভেতরের নিম্নস্তরের পৃথিবীর শেষ চিহ্নটুকুও মোরাক্বাবাহ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে মুছে ফেলে। ধার্মিক ও পবিত্রদের মাক্বাম অর্জন সম্ভব নয় যদি তাদের গুণাবলী কেউ অর্জন না করে। মোরাক্বাবাহতে এবং সাধনায় সামান্য ত্রুটি সালিকের বিরাট ক্ষতি করতে পারে। নীচের আয়াতটি এ বিষয়ে আলো দান করে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن

مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ...﴿١٤٤﴾

"মুহাম্মাদ রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর আগে অন্যান্য রাসূলরা গত হয়েছে। এরকম হবে কী যে যখন সে মৃত্যুবরণ করবে অথবা নিহত হবে, তোমরা তোমাদের গোড়ালীর উপর ঘুরে যাবে ?" (সূরা আল ইমরান- ১৪৪)

অতএব সালিক অবশ্যই ভেতর থেকে ও বাহির থেকে তার ক্বলবকে পরিষ্কার করবে এবং নিজেকে পবিত্র করবে যেন পবিত্র আত্মাদের মাঝে তার স্থান অনুগৃহিত হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ... ﴿﴾

"পরিত্যাগ করো বাহিরের ও ভেতরের গুনাহসমূহ।"

(সূরা আল-আনয়াম ঃ ১২০)

এ আয়াত অনুযায়ী কাজ করে সালিককে অবশ্যই সকল স্তরগুলো অতিক্রম করতে হবে যা তাকে একাগ্রচিত্ত দাসত্বের স্তরে পৌঁছে দেবে।

এ স্তরগুলো নীচের আয়াতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ •

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ

مُّقِيمٌ • خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿﴾

"যারা বিশ্বাস করেছে, হিযরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ও তাদের জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা অনেক বেশী সম্মানিত। এরাই হচ্ছে তারা যারা বিজয়ী। তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর ক্ষমার এবং কবুলের এবং জান্নাতের, যেখানে চিরস্থায়ী আনন্দ হবে তাদের জন্য, তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে। অবশ্যই আল্লাহর সাথে রয়েছে এক মহা পুরষ্কার।" (সূরা তাওবাহ ঃ ২০-২২)

এ আয়াত অনুযায়ী একাগ্রচিত্ত দাসত্বের আগে চারটি পৃথিবী রয়েছে (১) ইসলামের পৃথিবী (২) বিশ্বাসের পৃথিবী (৩) হিযরতের পৃথিবী এবং (৪) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পৃথিবী। নবী (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী "আমরা ছোট একটি জিহাদ থেকে ফিরে এসে একটি বড় জিহাদে উপনীত হয়েছি।" সালিকের সংগ্রাম হচ্ছে একটি বড় জিহাদ এবং একই ভাবে ইসলামও হবে একটি বড় ইসলাম এবং বিশ্বাসও হবে একটি বড় বিশ্বাস। ইসলাম ও বিশ্বাসের স্তর অতিক্রম করে তার যথেষ্ট সাহস জোগাড় করা উচিত যেন সে যাহেরী রাসূল (সাঃ) অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীর সাহায্য নিয়ে বাতেনী রাসূলের সোহবাতে হিযরত করতে পারে। এভাবে তার উচিত আত্মশুদ্ধি অনুশীলন করা যেন সে আল্লাহর রাস্তায় নিহতদের মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

সালিকের মনে রাখতে হবে যে তার আধ্যাত্মিক সফরের শুরু থেকে আত্মশুদ্ধি পর্যন্ত তাকে অনেক বাধার মুখোমুখি হতে হবে যা মানুষের অথবা শয়তানের দ্বারা তৈরী। আত্মশুদ্ধি এবং শহীদের মর্যাদা লাভের আগে তাকে বড় ইসলাম ও বড় বিশ্বাসের পৃথিবী অতিক্রম করতে হবে। আধ্যাত্মিক সফরে বড় ইসলাম, বড় বিশ্বাস, বড় হিযরত ও বড় জিহাদ হচ্ছে শেষ ধাপের আগের স্তর। এ স্তরগুলোর যে বাধা রয়েছে সেগুলোকে বড় কুফুরী ও বড় মোনাফেকী বলা হয়। এ স্তরে ছোট শয়তানগুলো সালিকের কোন ক্ষতি করতে পারেনা, কিন্তু শয়তান (ইবলিস), যে তাদের সবচেয়ে বড় সর্দার তখনও তার অগ্রযাত্রাকে

বাধাগ্রস্থ করতে চায়। অতএব এ স্তরগুলো অতিক্রম করবার সময় সে যেন না ভাবে সে বিপদ মুক্ত। যতক্ষণ সে উপরে উল্লেখিত বড় পৃথিবীগুলো অতিক্রম না করে ততক্ষণ শয়তান তার রাস্তায় বাধা দিতেই থাকবে।

সালিকের উচিত তার উদ্যম বজায় রাখা এবং শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থাকা, যেন সে বড় কুফুরী অথবা বড় মোনাফেকীতে জড়িয়ে না যায়। বড় ইসলাম ও বড় বিশ্বাসের পৃথিবী অতিক্রম করে সালিক বড় হিযরত শুরু করে এবং এরপর আত্মশুদ্ধি দ্বারা সে বড় আত্ম পূর্ণজাগরণের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং এরপর আল্লাহর প্রতি যারা একাগ্রচিত্ত তাদের উপত্যকায় প্রবেশ করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সাফল্য দান করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বারোটি পৃথিবী

উপরে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে একজন আশেক যিনি আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিয়োজিত, তাকে বারোটি পৃথিবী অতিক্রম করতে হবে একাগ্রচিত্ততার পৃথিবীতে প্রবেশের আগে। এ পৃথিবীগুলোর নাম হচ্ছে ঃ

ছোট ইসলাম, বড় ইসলাম, উচ্চতর ইসলাম*(ইসলাম-ই-আসগর, ইসলাম-ই-আকবর, ইসলাম-ই-আ'জাম);* ছোট বিশ্বাস, বড় বিশ্বাস, উচ্চতর বিশ্বাস*(ঈমান-ই-আসগর, ঈমান-ই-আকবর, ঈমান-ই-আ'জাম)*; ছোট হিযরত, বড় হিযরত, উচ্চতর হিযরত*(হিজরাত-ই-সুগরা, হিজরাত-ই-কুবরা, হিজরাত-ই-উজমা)*; ছোট জিহাদ, বড় জিহাদ এবং উচ্চতর জিহাদ*(জিহাদ-ই-আসগর, জিহাদ-ই-আকবর, জিহাদ-ই-আ'জাম)*। এ পৃথিবীগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন এবং তাদের বাধা বিপত্তিগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন কেননা সালিক এদের দিকে এগিয়ে যাবার সময় সেসবের মুখোমুখি হবে। আমাদের কথা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য আমরা এ পৃথিবীগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

বড় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর কোন কাজের সমালোচনা না করা এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা যে যা ঘটছে তা কোন লাভ ছাড়া নয় এবং যা ঘটছে না তা আসলে উচিত নয়। ইমাম আলী (আঃ) এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন তিনি বলেন, "একজন আশেকের আসমানী আদেশ নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগতো থাকবেই না, বরং সে তার অন্তরে এদের বিষয়ে সামান্য অসন্তোষও অনুভব করবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ

يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴿﴾

"কিন্তু না। তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা বিশ্বাসী হতে পারবে না যতক্ষণ না যে বিষয়ে বিভেদে আছে সে বিষয়ে তারা তোমাকে বিচারক মেনে না নেয়

এবং তারা তাদের অন্তরে তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অপছন্দ অনুভব না করে এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ না করে।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

এটি হচ্ছে উচ্চতর ইসলামের স্তর। এ স্তরে ইসলাম সাধকের আত্মায় প্রবেশ করবে এবং সত্যিকারভাবে ইসলাম তার হৃদয়কে ও জীবনকে পরাভূত করবে।

যখন আশেকের হৃদয় উচ্চতর ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে, তখন তার ক্বলবই শুধু সাক্ষ্য দেয় না যে সবকিছু আল্লাহ থেকে আগত, বরং সে শারীরিকভাবেও এ সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। অন্য কথায়, সে প্রায়ই তার হৃদয়ের দু'চোখ দিয়ে দেখতে পায় যে আল্লাহ সবদিকে উপস্থিত এবং সবকিছু জানেন। এ স্তরটি অবলোকনও উচ্চতর ইসলামের স্তর, কিন্তু সালিক যেহেতু এখনও পূর্ণতা অর্জন করেনি তাই তাকে অনেক বস্তুগত বাধার মুখোমুখি হতে হয়, বিশেষ করে যখন সে তার প্রকৃতিগত প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকে এবং একটি অন্যমনস্কতার অবস্থা তাকে আচ্ছাদিত করে। অতএব তার জন্য জরুরী যে, সে তার ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করবে যেন অবলোকনের এ অবস্থাটি তার জন্য একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তার অন্যান্য ক্রিয়াকলাপকে যেন তা বিঘ্নিত না করে। এজন্য উচ্চতর ইসলামের এ অবস্থাকে ঠেলে আত্মায় প্রবেশ করানোটা জরুরী যেন এ প্রাথমিক অবস্থাটি একটি পূর্ণ বর্ধিত অবস্থায় পরিণত হয়, যা অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবিভাগের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করবে। এটি হচ্ছে সেই স্তর যাকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা ইহসানের (কল্যাণ) মাক্বাম বলেন। কোরআন বলে ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾

"যারা আমাদের রাস্তায় সংগ্রাম করে অবশ্যই আমরা তাদেরকে পথ দেখাই। অবশ্যই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা কল্যাণ করে"।

(সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

আল্লাহর পথে সংগ্রামী কোন ব্যক্তি হেদায়েতের পথ এবং আল্লাহর নৈকট্য খুঁজে পায় না, যতক্ষণ না সে ইহসানের (কল্যাণের) স্তরে পৌঁছে। নবী (সাঃ) এর একজন বিশ্বস্ত সাহাবী তাঁকে ইহসানের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবী (সাঃ) বললেন ঃ "তুমি আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে

দেখতে পাচ্ছো। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।" অন্য কথায় মানুষের উচিত এভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। যদি সে এভাবে তাঁর ইবাদাতে সক্ষম না হয়, তাহলে এর চেয়ে নীচু স্তরের ইবাদাতও রয়েছে। সে যেন আল্লাহর ইবাদাত করে এভাবে যেন আল্লাহ তাকে দেখছেন। যতক্ষণ আশেক বড় বিশ্বাসের স্তরে না পৌঁছে ততক্ষণ সে শুধু মাঝে মাঝে কল্যাণের অবস্থার সাক্ষাৎ পায়। এ অবস্থায় সে ইবাদাতসমূহ উদ্যম ও আনন্দের সাথে সম্পাদন করে। তার আত্মায় ঈমান প্রবেশ করবার কারণে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বিভাগকে তা সঠিক কাজে নিয়োজিত করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বিভাগসমূহ যখন একবার নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তখন এক মুহূর্তের জন্যও তারা আর অবাধ্য হয় না। যারা উচ্চতর বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছেছে তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ •

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿﴾

"সফলকাম সেই বিশ্বাসীরা যারা তাদের নামাযে বিনয়ী এবং যারা পরিত্যাগ করে যা কিছু অর্থহীন।" (সূরা মুমিনুন ঃ ১-৩)

শুধু ঐ ব্যক্তি নিজেকে ফালতু জিনিসে ব্যস্ত রাখবে যে সেগুলোতে আগ্রহী। একজন সালিক, যে বড় বিশ্বাসের স্তর অর্জন করেছে, যার কল্যাণ করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সে কোন অর্থহীন বিষয়কে ভালোবাসতে পারে না। আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ... ﴿﴾

"আল্লাহ কোন মানুষকে তার দেহের ভেতর দুটো হৃদয় দেন নি।"

(সূরা আহযাব ঃ ৪)

যদি আমরা দেখি কোন আশেক তার সময়কে আনন্দ ফুর্তিতে ব্যয় করছে তাহলে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি সে আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি নিমগ্ন নয় এবং তার হৃদয় মোনাফেকী মুক্ত নয়। যাকে এ পর্যায়ে উচ্চতর

মোনাফেকী বলা হয় এবং যা হচ্ছে উচ্চতর ঈমানের বিপরীত। এ মোনাফেকীর কারণে মানুষ তার অভ্যন্তরীণ উৎসাহ অনুযায়ী কাজ করে না, বরং সে যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হয়। নীচের আয়াতটি এ ধরনের মোনাফেকী বর্ণনা করে ঃ

وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ ...﴾

"তারা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়"।

(সূরা নিসা ঃ ১৪২)

যখন সালিক উচ্চতর বিশ্বাসের স্তর অর্জন করে তখন মোনাফেকীর কোন চিন্তা তার ভেতর আর থাকে না। তার কাজকর্ম তার যুক্তির অনির্ভরযোগ্য আদেশে বা ভয়ে, প্রয়োজন বা রক্ষণশীলতার কারণে পরিকল্পিত হয় না। তার সব কাজ কর্ম এ সময় উৎসাহিত হয় তার অভ্যন্তরীণ উদ্যম, হৃদয়ের ঝোঁক এবং প্রকৃত ভালবাসার কারণে। যখন সালিক উচ্চতর ঈমান অর্জন করে তখন তার উচিত উচ্চতর হিযরতের জন্য প্রস্তুত থাকা। এ হিযরতের দু'টো দিক রয়েছে ঃ একটি হচ্ছে শারীরিক হিযরত, যার অর্থ হচ্ছে খারাপ লোকদের সাথে সামাজিক লেনদেন পরিত্যাগ করা এবং অন্যটি হচ্ছে ক্বলবের হিযরত, যার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। একজন সালিক আল্লাহ্‌র রাস্তা অন্বেষণে যা কিছু বাধা দেয় এমন সব অভ্যাস, নিয়ম ও আচার-ব্যবহার শুধু পরিত্যাগই করবে না বরং তার হৃদয়ের গভীর থেকে এগুলোকে অপছন্দও করবে। এ ধরণের নিয়ম ও আচার-ব্যবহার বেশির ভাগই অবিশ্বাসীদের দেশগুলো থেকে আমদানী করা হয়েছে। একজন মানুষ, যে বস্তুগত সমাজে বাস করছে সে অনেক নিয়ম-নীতি ও স্বভাবের কাছে বন্দী হয়ে যায় যেগুলো দুনিয়াবি লোকদের মাঝে প্রচলিত আছে ও তা তাদের সামাজিক লেনদেনের ভিত্তি হয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ, এটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন আত্মিক আলোচনায় চুপ করে থাকে তাহলে তাকে অজ্ঞ মনে করা হয়। অনেকে মনে করে কোন সভার মঞ্চের সামনে বসা অথবা অন্যদের সাথে হাঁটার সময় আগে আগে চলা তাদের জন্য মর্যাদার চিহ্ন। সুন্দর কথা ও তোষামোদ ভালো আচরণ বলে মনে করা হয় এবং এ নিয়মের বিপরীতে কোন আচরণ হলে এগুলোকে খারাপ আচরণ ও অসভ্যতা বলে মনে করা হয়। এ ধরনের নিয়ম-নীতি ও যাচ্ছে-তাই ধারণাকে আল্লাহর সাহায্যে সালিকের উপেক্ষা করা উচিত। এ

ব্যাপারে সে কাউকে ভয় করবে না এবং যারা নিজেদেরকে বিরাট জ্ঞানী বলে দাবী করেন তাদের সমালোচনাতেও কোন কান দিবে না। কুলিয়ানীর 'জামী' নামক বইতে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদীস রয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ "কুফুরীর চারটি স্তম্ভ রয়েছে ঃ লোভ, ভয়, ঘৃণা ও রাগ।" এ হাদীসে 'ভয়' হচ্ছে এ আশঙ্কা যে লোকজন রাগ করবে যদি তাদের ভুল ধারণা ও ভুল নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করা হয়।

সংক্ষেপে, সালিক ঐসব স্বভাব, রীতি-নীতি এবং আচার ব্যবহারকে বিদায় জানাবে যেগুলো তাকে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়াতে বাধা দেয়। আধ্যাত্মিক সাধকরা এ মনোভাবকে বলেন 'পাগলামী'; কারণ পাগল লোকেরা জনপ্রিয় স্বভাব ও রীতিসমূহে সামান্যই আগ্রহ রাখে এবং অন্যরা কী বলবে সে ব্যাপারে কোন পাত্তাই দেয় না। একজন পাগল ব্যক্তি তার নিজের রাস্তায় লেগে থাকে এবং কোন বিরোধিতাকে ভয় করে না।

হিযরতে সফলতা ও প্রচলিত রীতি-নীতির বিদায়ে তার সফলতার পর সালিক বড় জিহাদের ময়দানে প্রবেশ করে, যার অর্থ হচ্ছে একদল শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা। এখনও এ স্তরে সালিক নিজের নীচ স্বত্তার কামনা ও লালসার কাছে পরাজিত এবং ভয় ও দুঃশ্চিন্তায় বিমূঢ় থাকে। এমনকি রাগ ও হতাশার কাছেও বন্দী থাকে।

যদি কিছু ঘটে যা তার পছন্দের নয় তাহলে সে রাগ করে এবং আহত হয়। সকল দুঃশ্চিন্তা, দুঃখ ও ব্যাথা দূর করতে সালিকের উচিত আসমানী সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ভয়, রাগ ও লালসার বাহিনীকে ধ্বংস করা। দুনিয়াবি জ্বালা যন্ত্রণা ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার পর সে উচ্চতর ইসলামের পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এরপর সে অনুভব করে সে যেন সারা পৃথিবীর উপর বিজয়ী হয়ে আছে, মৃত্যু ও মুছে যাওয়া থেকে নিরাপদ আছে এবং সব ধরনের সংঘর্ষ থেকে মুক্ত আছে। সে নিজের ভেতরে একটি পবিত্রতা ও চাকচিক্য অনুভব করে যা এ অধম পৃথিবীর সাথে যুক্ত নয়। এ স্তরে সালিক এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তা এমন যেন সে মৃত। এখন সে নুতন জীবন শুরু করে। মানবিক এক পৃথিবীতে বাস করে; কিন্তু সে সবকিছুকে ফেরেশতাদের দুনিয়ার আকারে দেখতে পায়। বস্তুগত বিষয় তার আর কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেহেতু সে নিজ সত্তার পুনরুত্থানের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে তাই তার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে পর্দা উঠিয়ে ফেলা হয় এবং সে অনেক লুকানো জিনিস

দেখতে পায়। এ মাক্বামটি উচ্চরত ইসলামের। কোরআন পরিস্কারভাবেই এটিকে উল্লেখ করেছে এভাবে ঃ

أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي

بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿﴾

"যে মৃত ছিলো এবং আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তার জন্য একটি আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে মানুষের ভেতরে হাঁটে, সে কি তার মত যে রয়েছে ঘোর অন্ধকারে যেখান থেকে সে বের হয়ে আসতে অক্ষম। এভাবে অবিশ্বাসীদের আচরণকে সুশোভিত করা হয়েছে।" (সূরা আন'আম ঃ ১২২)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿﴾

"যেই সঠিক কাজ করে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী এবং সে একজন বিশ্বাসী, অবশ্যই আমরা তাকে একটি ভালো জীবন ত্বরান্বিত করবো এবং আমরা তাদেরকে প্রতিদান দেবো ঐ অনুযায়ী যা তারা করতো।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯৭)

মনে রাখা উচিত যে আশেক এ অবস্থায় যা অবলোকন করে তা তার ভেতরে মিথ্যা অহংকার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে তার সবচেয়ে খারাপ শত্রু যা আসলে তারই নীচ সত্তা, তাকে প্রতিরোধ করা শুরু করতে পারে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "তোমার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হচ্ছে তোমার নীচ সত্তা যা তোমার ভেতরে রয়েছে।"

এ পরিস্থিতিতে আশেক বৃহত্তর কুফুরীতে লিপ্ত হবার বিপদে থাকে যদি সে মহান আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত না হয়। নিচের হাদীসটি এ ধরনের কুফুরীর কথা বলেঃ

"নিজের নীচ-সত্তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্তি।"

এটি হচ্ছে ঐ মূর্তিপূজা যা থেকে নবী ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন "আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা করুন।" পরিষ্কারভাবেই এটি অচিন্তনীয় যে নবী ইবরাহীম (আঃ) কখনো বানানো মূর্তির ইবাদাত করবেন। এ ধরনের মূর্তি পূজা থেকে নবী (সাঃ)-ও আশ্রয় চেয়েছিলেন যখন তিনি বলে ছিলেনঃ "হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে লুকানো শিরক থেকে আশ্রয় চাই।"

অতএব আশেক যেন আন্তরিকতার সাথে তার দুর্বলতা স্বীকার করে অন্তর থেকে আত্ম অহংকারকে বের করে দেয়, যাতে সে বৃহত্তর কুফুরী করে না বসে এবং উচ্চতর ইসলাম অর্জনে সফল হয়। কিছু আধ্যাত্মিক সাধক তাদের সারা জীবন ব্যাপী 'আমি' শব্দটি ব্যবহারে বিরত থেকেছেন। অন্যরা যা কিছু ভালো তা আল্লাহর কৃতিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন এবং যা কিছু আল্লাহর বলা যায় না তা তারা নিজের উপরে নিয়েছেন। কোন বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তারা বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করেছেন যা আল্লাহ ও তাদের উভয়ের প্রতি আরোপিত হতে পারে। তারা এ পদ্ধতিটি নবী মুসা (আঃ) এবং খিযির (আঃ) এর ঘটনা থেকে গ্রহণ করেছেন ঃ খিযির (আঃ) বললেন ঃ

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ

أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿﴾

"আর নৌকার বিষয়ে, এটি গরীব মানুষদের জন্য ছিলো যারা নদীতে কাজ করতো এবং আমি চাইলাম তা ডুবিয়ে দিতে, কারণ তাদের পিছনে ছিলো এক বাদশাহ যে প্রত্যেক নৌকা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দখল করছিলো।"

(সূরা কাহাফ ঃ ৭৯)

যেহেতু ডুবিয়ে দেয়া আল্লাহর কৃতিত্বে দেয়া যায় না তাই তিনি তা নিজের উপরে নিলেন এবং সর্বনাম ব্যবহার করলেন।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا •

فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿﴾

"এবং বালকের বিষয়টি, তার পিতা-মাতা ছিলো বিশ্বাসী এবং আমরা আশঙ্কা করলাম, সে তাদেরকে নিপীড়ণ করবে বিদ্রোহ ও কুফুরী দিয়ে এবং তাই আমরা চাইলাম তাকে বদলে দিতে, তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়ার নিকটবর্তী একজন দিয়ে।" (সূরা কাহাফ ঃ ৮০-৮১)

এখানে বালককে হত্যা করা আল্লাহ ও খিযির (আঃ) উভয়ের প্রতি আরোপ করা যায়, তাই বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ

تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا

أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ...﴿٨٢﴾

"আর দেয়ালটির বিষয়ে, এর মালিক ছিলো শহরের দুই এতিম বালক, এবং এর নীচে ছিলো ধন ভান্ডার যারা এর মালিক ছিলো এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মশীল। তোমার রব চাইলেন তারা তাদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হোক এবং তাদের ধনভান্ডার বের করে আনুক তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে একটি রহমত হিসাবে।" (সূরা কাহাফ ঃ ৮২)

যেহেতু কারো কল্যাণ করা আল্লাহর প্রতি আরোপ করা যায় অতএব তা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। আমরা ইবরাহীম (আঃ)-কেও এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করতে দেখি। তিনি বলেছেনঃ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ • وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ •

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿﴾

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান এবং তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং আমি যখন অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে সুস্থ করেন।" (সূরা শু'আরা ঃ ৭৮-৮০)

এখানে নবী ইবরাহীম (আঃ) রোগকে নিজের উপর আরোপ করেছেন এবং আরোগ্যকে আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করেছেন।

বড় ইসলামের স্তর অর্জনে এবং আত্ম প্রতারণা সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য একজন ভক্তের উচিত সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

হাজ্বী ইমাম কূলী নাখজাওয়ানী, আগা মীর্যা আলী ক্বাযীর পিতা আগা সাইয়্যেদ হুসাইন আগা ক্বাযীর আধ্যাত্মিক উস্তাদ ছিলেন। তিনি নৈতিকতায় ও আধ্যাত্মিকতায় তার প্রশিক্ষণ শেষ করেন সাইয়্যেদ কুরাইশ ক্বাযভিনীর হাতে। তিনি বলেন যখন তার বয়স হয়ে গেলো, একদিন তিনি দেখলেন শয়তান একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার দাড়িতে হাত বুলালেন এবং শয়তানকে বললেন, "এখন আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, দয়া করে আমাকে রেহাই দাও, যদি পারো।" শয়তান বললো ঃ "এদিকে দেখো"। সাইয়্যেদ কাযভিনী বলেন তিনি যখন সেদিকে তাকালেন, তিনি এমন একটি গভীর গর্ত দেখতে পেলেন যে, তার শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা একটি স্রোত বয়ে গেল। শয়তান ঐ গর্ত দেখিয়ে বললো ঃ "কারো জন্য আমার কোন দয়া মায়া নেই। আমি যদি একবার তোমার উপর হাত দিতে পারি তুমি ঐ গর্তের তলায় গিয়ে পড়বে, যেখান থেকে তুমি কখনোই আর বেরিয়ে আসতে পারবে না"।

উচ্চতর ইসলামের পরই রয়েছে উচ্চতর ঈমান, যার অর্থ হচ্ছে উপরের দিকে বড় ইসলামের এত তীব্র উত্থান যে, তা সত্যের জ্ঞানকে পরিবর্তন করে একে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান করে তোলে। এ সময় সালিক আলামে মালাকূত (ফেরেশতাদের জগৎ) থেকে আলামে জাবারুত বা আত্মার জগতে

প্রবেশ করে। তার জন্য অবশ্য উচ্চতর আত্মিক পুনরুত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে এবং এখন সে আত্মার জগতের দৃশ্যগুলো দেখতে পায়।

এরপর সালিকের উচিত নিজের অস্তিত্ব থেকে হিযরত করা, যে অস্তিত্বকে তার পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তার এ ভ্রমণ হবে তার নিজ অস্তিত্ব থেকে পরম অস্তিত্বের দিকে। কোন কোন কামেল এ ধারণাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ "নিজ সত্তাকে ছেড়ে আসো।"

এ আয়াতটি এদিকেই ইঙ্গিত করে ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً •

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসো তাঁর সন্তুষ্টিতে ও সন্তুষ্টচিত্তে, আমার দাসদের মধ্যে প্রবেশ করো, আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"

(সূরা ফজর ঃ ২৭-৩০)

এ আয়াতে আত্মাকে সন্তুষ্ট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এভাবেই সম্বোধন করা হয়েছে। একে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবার জন্য এবং বেহেশতে প্রবেশের জন্য।

সালিক এতক্ষণে বড় জিহাদের স্তর অতিক্রম করেছে এবং জয় ও বিজয়ের পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে যা হচ্ছে সন্তুষ্টির সদর দফতর, কিন্তু তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন তখনও রয়ে যায়, সে এখনও আত্মবিলীন হবার পথ শেষ করেনি এবং তাই উচ্চতর জিহাদের স্তরে উঠা তার প্রয়োজন। তার এ কমতি থাকার কারণে সে তখনও পরিপূর্ণভাবে মুক্ত নয়। তার অবস্থান এখনও সেই শহরে যা কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿﴾

"সত্যবাদিতার বাসস্থানে, শক্তিশালী বাদশাহর সাথে।" (সূরা ক্বামার ঃ ৫৫)

এ স্তরের পর সালিকের উচিত নিজের অবশিষ্ট অস্তিত্বের চিহ্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা যেন সে আরেক পা এগিয়ে পরম একত্বের ময়দানে প্রবেশ করতে পারে। এ পৃথিবীকে বলা হয় জয় এবং বিজয়ের পৃথিবী। সালিককে এ ধরনের বারোটি পৃথিবীর ভেতর দিয়ে যেতে হয়, উচ্চতর হিযরত ও উচ্চতর জিহাদের ময়দানের আগে। এর পর সে একাগ্রচিত্ততার ময়দানে প্রবেশ করবে। তাকে সফলকাম এবং বিজয়ী বলা হবে এবং সে প্রবেশ করবে একাগ্রচিত্তদের পৃথিবীতে এবং

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿﴾

"আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাবো।"

(সূরা বাকারাহ ঃ ১৫৬)

তার জন্য উচ্চতর আত্মসত্তার পুনরুত্থান ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে। সে দেহ, আত্মা এবং যেগুলো নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত এসব কিছুর পর্দা অতিক্রম করে নিজ সত্তা থেকে পূর্ণ ফানাহ্‌র স্তরে প্রবেশ করে। তার এক পা থাকে আসমানী জগতে এবং সে ঐ স্তরকে অতিক্রম করে ফেলে যে বিষয়ে কোরআন বলে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ... ﴿١٨٥﴾

"সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

এ ধরনের লোক চেতনার দিক থেকে জীবিত অথচ নিজ সত্তা থেকে ফানাহ্‌তে চলে যাবার অবস্থার কারণে তাকে বলা যায় যে সে মৃত। তাই ইমাম আলী (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে কেউ একজন মৃত ব্যক্তিকে হাঁটতে দেখতে চায়, সে যেন আলী ইবনে আবু তালিবের দিকে তাকায়।"

বিশদ ব্যাখ্যা ঃ আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং এদের চিহ্নসমূহ এবং পরিণতিসমূহ সম্পর্কে উপরে সংক্ষেপে যা বলা হয়েছে তা হলো আল্লাহ্‌র অনুদানসমূহ যা শুধুমাত্র শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য দান করা হয়েছে। পূর্বের জাতি সমূহের সালিকরা যে ধরনের আত্মিক উন্নতি ও সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারতো তা ছিল সীমাবদ্ধ। নিজ সত্তা থেকে ফানাহ্‌র পর্যায় পর্যন্ত

পৌঁছে তারা খোদায়ী নামসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অবলোকন করতে পারতো, কিন্তু এর পর আর এগুতে পারতো না। কারণ ছিলো যে তারা আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ যে স্তরে পৌঁছাতেন তা হলো এ কথা- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্", যার অর্থ ছিলো আল্লাহ্‌র সব চাইতে সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলীসমূহ। অন্যাদিকে, ইসলামী উম্মাহ্‌র সালিকরা এর চাইতে আরো বেশ কিছু ধাপ উপরে পৌঁছেছে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ হলো ইসলামী আইনের পথ নির্দেশক আলো হলো এ কথা- "আল্লাহ্ বর্ণনারও বহু উপরে।"

একজন মুসলমান যে এ কথার সাথে যুক্ত তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির স্ত রসমূহ যা সে পরিভ্রমণ করে, তা এতই উঁচু যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এজন্যই আগের নবীরাও খোদায়ী নামসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের উপরের কোন স্তরের কথা চিন্তা করতে পারতেন না, যার ফলে তারা বহু অসুবিধা ও কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতেন এবং এগুলো থেকে মুক্ত হতেন পবিত্র নবী (সাঃ), ইমাম আলী (আঃ), ফাতিমা যাহরা (আঃ) এবং তাদের বংশের বেলায়েতের (অভিভাবকত্ব) মাক্বাম উল্ল্যেখ করে। এ ব্যক্তিত্বদের আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্ব পূর্ববর্তী নবীদের দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে মুক্তি দিতো। যদিও পূর্ববর্তী নবীরা ইমামদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন ছিলেন এবং এজন্যই তা প্রার্থনায় উল্লেখ করতেন কিন্তু তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত এর বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতেন না। কোরআনের কিছু আয়াত দেখায় যে নবী ইবরাহীম (আঃ) একবার কি দুবার এ উচ্চতর সত্য অবলোকন করেছিলেন, তাও মুহূর্তের জন্য। তাদের স্থায়ী খেলাফত শুধু পরবর্তী পৃথিবীতে।

আমাদের এ অভিমতের সমর্থনে কোরআনের আয়াত উল্লেখ করার আগে বলা যায় যে, কোরআনের কথা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, একাগ্রচিত্ততার আবার বেশ কিছু স্তর রয়েছে। কারণ কিছু সংখ্যক নবী যারা কিছুটা হলেও এ মাক্বামের অধিকারী ছিলেন তারা এর উচ্চতর মাক্বামগুলো অর্জন করতে পারছিলেন না এবং এ জন্য তারা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতেন। উদাহরণস্বরূপ, কোরআন বলছে নবী ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে ঃ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

"অবশ্যই সে ছিলো আমাদের একাগ্রচিত্ত দাসদের একজন।"

(সূরা ইউসূফ ঃ ২৪)

এরপরও তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন ঃ

أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿﴾

"আপনি আমার নিরাপত্তা দানকারী বন্ধু এ পৃথিবীতে এবং আখেরাতে। আমাকে মৃত্যু দিন আপনার কাছে আত্ম-সমর্পিত হিসেবে এবং আমাকে সালেহদের সাথে যুক্ত করুন।" (সূরা ইউসূফ ঃ ১০১)

এ দোয়াটি প্রমাণ করে তিনি যে মাক্বামটি নিজের জন্য চাইছিলেন তা তার জীবিত কালে অর্জন করতে পারেন নি, আর তাই তিনি প্রার্থনা করলেন যেন তার মৃত্যুর পর তাকে তা দেয়া হয়। তার এ প্রার্থনা আখেরাতে পূর্ণ করা হবে কিনা সে ব্যাপারে কোরআন নীরব। ইবরাহীম (আঃ) একাগ্রচিত্ততার উচ্চতর মাক্বাম অর্জন করেও প্রার্থনা করছেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿﴾

"হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সালেহদের অন্তর্ভূক্ত করুন।"

(সূরা শু'আরা ঃ ৮৩)

এটি প্রমাণ করে সালেহদের মাক্বাম একাগ্রচিত্তেরও উপরে। আর তাই নবী ইবরাহীম (আঃ) চেয়েছিলেন তাকে তাদের সাথে যুক্ত করতে যারা এ মাক্বাম অধিকার করে আছেন। আল্লাহ্ এ পৃথিবীতে তার এ দোয়া কবুল করেন নি, কিন্তু অঙ্গীকার করেছেন তা তাকে দিবেন আখেরাতে, যা সে চেয়েছে ঃ

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿﴾

"নিশ্চয়ই আমরা তাকে এ পৃথিবীতে নির্বাচন করেছিলাম এবং আখেরাতে সে অবশ্যই সালেহদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সূরা বাকারাহ্ ঃ ১৩০)

এটি লক্ষ্য করা যায় যে, সালেহদের মাক্বাম যার জন্য পূর্ববর্তী নবীরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তা নবী ইবরাহীম (আঃ) ও তার বংশধরকে যা দেয়া হয়েছে তা থেকে আলাদা। এ আয়াত বলে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿﴾

"আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও নাতি হিসাবে ইয়াকুবকে। আমরা প্রত্যেককে সালেহ বানালাম।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭২)

এ ধরনের সালেহ তারা সবাই ছিলেন, নবী ইবরাহীম (আঃ) সহ। কিন্তু এর পরেও তিনি তা প্রার্থনা করছিলেন সালিহদের সাথে যুক্ত করে দেয়ার জন্য। এটি প্রমাণ করে যে তাকে যা ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে তা থেকে উচ্চতর কিছু তিনি চাইছেন।

নবী (সাঃ) এবং আরো কিছু ব্যক্তিত্ব তাদের জীবদ্দশাতেই যে এ উচ্চতর মাক্বাম অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ এ আয়াতটি ঃ

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿﴾

"নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছে আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি সালেহদের সাথে বন্ধুত্ব করেন।" (সূরা আ'রাফ : ১৯৬)

এ আয়াত অনুযায়ী, প্রথমে নবী (সাঃ) স্বীকার করছেন আল্লাহ্ তার অভিভাবক এবং এরপর বলছেন, তাঁর অভিভাবক তিনি যিনি সালেহদের সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং নিরাপত্তা দেন। এটি প্রমাণ করে যে সে সময় আরো কিছু লোক ছিলো যারা সালেহদের মাক্বাম অধিকার করেছিলেন যাদের সাথে আল্লাহ বন্ধুত্ব করেছিলেন। তা আরো প্রমাণ করে যে কেন পূর্ববর্তী নবীরা ইমামদের মাধ্যমে তাদের প্রার্থনা করেছিলেন এবং কী সেই উচ্চ মর্যাদা যা এসব সালেহ ব্যক্তিরা অর্জন করেছিলেন যাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য ইবরাহীম (আঃ) এর মত বড় একজন নবী আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।

বড় নবীরা (আঃ) যে একাগ্রচিত্তের মাক্বামে পৌঁছেছিলেন তা কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে বোঝা যায়। কোরআন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে যে, একমাত্র একাগ্রচিত্তরাই আল্লাহ্র প্রশংসা যথাযথভাবে করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ • إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿﴾

"তাঁর প্রতি তারা যা আরোপ করেছে তার চেয়ে উপরে আল্লাহ, শুধুমাত্র আল্লাহ্র একাগ্রচিত্ত দাসরা ছাড়া, যাদের বিষয়টি ভিন্ন।"

(সূরা সাফ্ফাত ঃ ১৫৯-১৬০)

নবী (সাঃ)-কে তাঁর প্রশংসা করার জন্য আদেশ করে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ

خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর দাসদের উপর যাদের তিনি নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ্ কি উত্তম নাকি তারা, যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করা হয়েছে ?" (সূরা নামল ঃ ৫৯)

কোরআন ইবরাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ করেছে যিনি এ ভাষায় আল্লাহ্র প্রশংসা করেছেন ঃ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء ﴿﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে বুড়ো বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক্ব-কে দান করেছেন। আমার রব নিশ্চয়ই দোয়া শ্রবণকারী।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৯)

নবী নূহ (আঃ) কে আদেশ করা হয়েছিল যেন তিনি এভাবে আল্লাহ্র প্রশংসা করেন ঃ

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে যালেমদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" (সূরা মুমিনুন ঃ ২৮)

কিছু বিশেষ সম্মানিত নবীদের বিষয়ে কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে যে তারা একাগ্রচিত্ততার মাক্বাম অধিকার করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কোরআন বলছে ঃ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿﴾

"নিশ্চয়ই সে আমাদের একাগ্রচিত্ত দাসদের একজন।" (সূরা ইউসুফ ঃ ২৪)

মূসা (আঃ) সম্পর্কে তা বলে ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكَانَ رَسُولا نَّبِيًّا ﴿﴾

"এবং স্মরণ করো কিতাবে মূসাকে, সে ছিলো একাগ্রচিত্ত দাস, এবং সে ছিল আল্লাহ্‌র একজন রাসূল, একজন নবী।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৫১)

ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক্ব (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ •

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ الدَّارِ ﴿﴾

"এবং আমার দাসদের কথা উল্লেখ করো, ইবরাহীম, ইসহাক্ব এবং ইয়াকুব, শক্তিশালী ও সুক্ষ্মদর্শী। আমরা তাদেরকে পবিত্র করলাম এক পবিত্র চিন্তায়, আখেরাতের বাসস্থানের কথা স্মরণে রেখো।" (সূরা সাদ ঃ ৪৫-৪৬)

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রচিত্ত, নীচের আয়াত অনুযায়ী শয়তান তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না ঃ

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ • إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿﴾

"সে বললো, আপনার কসম, আমি তাদের প্রত্যেককে বিপথগামী করবো, শুধু তারা ছাড়া যারা আপনার একাগ্রচিত্ত দাস।" (সূরা সাদ ঃ ৮২-৮৩)

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ নয় তারাই শুধু শয়তানের মাধ্যমে প্রতারিত হয়ঃ

ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿﴾

"আমি তাদের উপর আসবো তাদের সামনে থেকে এবং তাদের পিছন থেকে; তাদের ডানদিক থেকে এবং তাদের বা দিক থেকে আর আপনি তাদের বেশির ভাগকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭)

বেশ কিছু নবী সম্পর্কে কোরআন বলছে তাদেরকে আল্লাহ্ বাছাই করেছিলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا

مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ

وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ •

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ •

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ •

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿﴾

"আমরা তাকে ইসহাককে দান করলাম এবং ইয়াকুবকে, এদের প্রত্যেককেই পথ দেখিয়েছিলাম, এবং নূহকে এর আগে পথ দেখিয়েছিলাম, তার বংশধর থেকে

আমরা পথ দেখিয়েছি দাউদকে, সুলাইমানকে, আইয়ুবকে, ইউসূফকে, মূসাকে এবং হারুণকে। এভাবে আমি ভালোদেরকে পুরস্কৃত করি এবং পথ দেখিয়েছি যাকারিয়াকে, ইয়াহইয়াকে, ঈসাকে, এবং ইলইয়াসকে। এদের প্রত্যেকেই ছিলো সালিহ এবং আমরা পথ দেখিয়েছিলাম ইসমাইলকে ও আলইয়াসায়াকে, ইউনুসকে ও লূতকে। এদের প্রত্যেককে আমরা বাকীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এবং তাদের কিছু পূর্বপুরুষদের, সন্তানদের এবং ভাইদের আমরা বাছাই করেছিলাম এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখিয়েছিলাম।"

(সূরা আন'আম ঃ ৮৪-৮৭)

এ আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, সব নবীরাই একাগ্রচিত্তদের স্থান অধিকার করেছিলেন, অথচ আগে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে অল্প কিছু নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি তাদেরকে বাছাই করেছেন। এর অর্থ তিনি অনেকের মাঝ থেকে তাদেরকে পছন্দ করেছিলেন।

যারা শয়তানের মাধ্যমে প্রতারিত ও লালায়িত হয় তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। অতএব আমরা বলতে পারি যে, যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ তাদেরকে শয়তান ফাঁদে ফেলতে পারে না কারণ তারা আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রচিত্ত। যখনই কোরআন কাউকে কৃতজ্ঞ বলে আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সে আল্লাহ্র একজন একাগ্রচিত্ত এবং মুখলেস দাস। উদাহরণসরূপ, নূহ (আঃ) সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴿﴾

"তারা ছিলো তাদের বংশধর যাদেরকে নূহের সাথে (নৌকায়) বহন করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিলো এক কৃতজ্ঞ দাস।" (সূরা বনি ইসরাইল ঃ ৩)

নবী লূত (আঃ) সম্পর্কে কোরআন বলছে ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ •

نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿﴾

"আমরা তাদের ওপর পাথরের একটি ঝড় পাঠালাম, শুধু লূত-এর পরিবার ছাড়া,

যাদেরকে আমরা রাত্রির শেষ প্রহরে উদ্ধার করেছিলাম আল্লাহ্র অনুগ্রহ হিসাবে। এভাবে আমরা পুরস্কৃত করি তাকে যে কৃতজ্ঞ।"

(সূরা ক্বামার ঃ ৩৪-৩৫)

ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে তা বলে ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ •

شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿﴾

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল একটি জাতি, আল্লাহ্র প্রতি অনুগত, প্রকৃতিগতভাবে ন্যায়পরায়ণ এবং সে মুশরিকদের একজন ছিল না। সে আল্লাহ্র নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল। আল্লাহ্ তাকে পছন্দ করেছিলেন এবং একটি সোজা পথ দেখিয়েছিলেন।" (সূরা নাহল ঃ ১২০ - ১২১)

অন্য সব নবী যাদেরকে কৃতজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে নীতিগতভাবে তারা মুখলেস ছিলেন।

উপরের আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: আমরা তাদেরকে বাছাই করেছি আর সব মানুষদের মধ্য থেকে, যেন তাদেরকে সতর্কতার সাথে তুলে এনে কোথাও নিরাপদে রাখা যায়। যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে তারা এর ভিত্তিতেই অন্য সব মানুষ থেকে আলাদা। এরা হচ্ছে ঐ মানুষেরা যারা শুধু আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রচিত্ত এবং তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এ বাছাই শুধু মুখলেস লোকদের জন্যই প্রযোজ্য, কারণ তারা নিজেদেরকে শুধু আল্লাহ্র সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছে এবং অন্য সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

অধিকন্তু, এ আয়াতে উল্লেখিত বাছাই কথাটি শুধু তাদের সাথেই সম্পর্কিত নয় যাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ বলেন: "আমরা তাদের পূর্বপুরুষদের সন্তানদের ও ভাইদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে পথ দেখিয়েছি। আমরা তাদেরকে বাছাই করেছি এবং সোজা পথে পরিচালিত করেছি।" এখানে ভাই কথাটি এ নবীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাইদেরও বোঝায় অর্থাৎ যারা তাদের সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে শরীক হয়। অতএব এ বক্তব্যটি সমস্ত নবীদের বেলায় প্রযোজ্য হয় বলে মনে হয় এবং নিরাপত্তার সাথেই যুক্তি দেয়া যায় যে, সমস্ত নবীরাই ছিলেন মুখলেস।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্‌র হেদায়েতের সন্ধান

প্রথম একজন সালিক যা করবে তা হচ্ছে যতটুকু সম্ভব সে বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে খোঁজ খবর নেবে যেন সে তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শনের সাথে পরিচিত হয়। তার উচিত হবে ব্যবহারিক প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ্‌র তাওহীদ এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নব্যুয়তের বিষয়ে এ ধরনের অনুসন্ধানের মাধ্যমে সে কুফুরীর রাজ্য থেকে ইসলাম এবং ঈমানে প্রবেশ করবে। এ জ্ঞান হচ্ছে তা যার ব্যাপারে ফকীহদের ঐক্যমত রয়েছে যে, এর অর্জন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী, প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে মৌলিক বিশ্বাস স্বীকার করে নেয়ার জন্য। যদি কোন ব্যক্তি তার সম্ভাব্য সবটুকু চেষ্টার পরও সন্তুষ্ট হতে না পারে, তবে হতাশ হবার কিছু নেই এবং তার উচিত দো'আ করা যেন সে তা বিনয় ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এ পদ্ধতিটি নবী ইদরিস (আঃ) ও তার শিষ্যরা অনুসরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বিনয়ের সাথে প্রার্থনার অর্থ হচ্ছে, সালিক তার দুর্বলতাগুলো স্বীকার করবে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আন্তরিকভাবে হেদায়েত চাইবে। কেননা তিনি সব সময় তাদেরকে সাহায্য করেন যারা সত্যকে আন্তরিকভাবে খোঁজে। কোরআন বলে ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ... ﴿﴾

"যারা আমাদের দিকে সংগ্রাম করে অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথ দেখাবো।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

আমার মনে আছে যখন আমি নাজাফে ছিলাম এবং হাজী মির্যা আলী ক্বাযী থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম, একদিন সকালে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম জায়নামাযে বসেই। হঠাৎ আমি দেখলাম যেন দুজন লোক আমার সামনে বসে আছেন। এদের একজন নবী ইদরীস (আঃ) এবং অন্যজন আমার ভাই মুহাম্মদ হোসেইন তাবাতাবাঈ। নবী ইদরীস (আঃ) কথা বলা শুরু করলেন। তিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন কিন্তু আমি তা শুনছিলাম আমার ভাইয়ের মাধ্যমে। তিনি বললেন ঃ "আমার জীবনে আমি অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম যা আমার কাছে মনে হয়েছিল তার সমাধান খুবই কঠিন

কিন্তু সেগুলো নিজে নিজেই সমাধান হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল অদৃশ্য জগত থেকে কোন আসমানী হাতে তার সমাধান হয়েছে। এ সকল ঘটনা আমার কাছে প্রথমবারের মত এ পৃথিবীর সাথে অদৃশ্য জগতের সংযোগের রহস্য খুলে ধরে এবং এ জগতের বাইরে যা রয়েছে তার সাথে আমার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে।"

তখন আমি অনুভব করলাম নবী ইদরীস (আঃ) যে সকল সমস্যার কথা বলছিলেন তা ছিল তার বাল্যকালের ঘটনাবলী। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আন্তরিকভাবে হেদায়েত চায় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য চাইবার সময় কোরআনের কিছু প্রাসঙ্গিক আয়াত বার বার যিকির করলে কাজে দিবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿﴾

"মনে রেখো, আল্লাহকে মনে রাখার মাধ্যমে ক্বলবসমূহ সন্তুষ্টি লাভ করে।"

(সূরা রা'আদ ঃ ২৮)

'ইয়া ফাত্তাহু' (হে দ্বার উন্মোচনকারী) ও ***'ইয়া দালিলাল মুতাহাইয়্যিরীন'*** (হে পথহারাদের পথ প্রদর্শনকারী) বার বার যিকির করাও কাজে দিবে। যাহোক এ যিকির করা যেন পূর্ণ মনোযোগ ও গভীরতার সাথে করা হয়।

আমার এক বন্ধু আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, একবার সে বাসে ইরান থেকে কারবালা যাচ্ছিল। এক সুঠামদেহী যুবক তার কাছেই বসে ছিল। তাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয় নি। হঠাৎ করেই যুবকটি কাঁদতে শুরু করে। আমার বন্ধুতো অবাক। সে সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে। সে বলল: অবশ্যই আমি তোমাকে আমার ঘটনা বলবো। আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমার শিশু বয়স থেকেই আমাকে এমনভাবে লালন-পালন করা হয়েছে যে আমি নাস্তিক হয়ে যাই। আমি কিয়ামতে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু ধার্মিক লোকদের প্রতি আমার একটি ভালবাসা ছিল - হোক তারা মুসলমান, খৃষ্টান অথবা ইহুদী। এক রাতে আমি আমার এক দল বন্ধুর সাথে পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম যেখানে কিছু 'বাহাই'ও উপস্থিত ছিল। কিছু সময়ের জন্য আমরা সবাই খেলা, গান ও নাচে অংশগ্রহণ করি কিন্তু শীঘ্রই আমি আমার জন্য

লজ্জা অনুভব করতে থাকি। তাই আমি উপরের তলায় গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি, আমি বললাম: হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য কর যদি সত্যিই তুমি থেকে থাকো। কিছুক্ষণ পর আমি নীচে আসলাম। সকালে আমরা সবাই যে যার দিকে চলে গেলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন পেশাগত দায়িত্বে আমার দলপতি ও কিছু কর্মকর্তাদের নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ দেখলাম আলোকিত চেহারার একজন সাইয়েদ (নবী-সাঃ এর বংশধর) আলেম আমার দিকে আসছেন। তিনি আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন তিনি আমার সাথে কিছু কথা বলতে চান। আমি বললাম আমি তার সাথে দেখা করবো পরের দিন দুপুরের পর। তিনি চলে যাবার পর কেউ কেউ এরকম একজন সুপরিচিত ধার্মিক লোককে এমন শীতল অভ্যর্থনা করায় আমার প্রতি অভিযোগ করলেন। আমি বললাম আমি ভেবেছি তিনি একজন অভাবী ব্যক্তি যিনি আমার সাহায্য চাইছেন।

ঘটনাচক্রে আমার দলপতি আমাকে পরের দিন দুপুরের পর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি কাজের জন্য উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। তিনি আমাকে যে সময় দিয়েছিলেন, আমি সেই আলেমকেও একই সময় দিয়েছিলাম। আমি নিজেকে বললাম, 'তার কাছে যাওয়ার আর সম্ভাবনা রইলো না'। পরের দিন ঐ নির্দিষ্ট সময়ে আমি অনুভব করলাম আমি ভাল বোধ করছি না। কয়েক মুহূর্ত পরই আমার বেশ জ্বর এসে গেলো এবং একজন ডাক্তার ডাকা জরুরী হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই আমার ইনচার্জ আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন তার জন্য যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইন-চার্জ এর প্রতিনিধি চলে যাবার সাথে সাথেই আমি নিজেকে সুস্থ অনুভব করতে লাগলাম। আমার তাপমাত্রা সাধারণ হয়ে গেল। আমি আমার অবস্থা নিয়ে একটু ভাবলাম এবং নিশ্চিত হলাম যে এ ঘটনার একটি রহস্য রয়েছে। অতএব আমি তৎক্ষণাৎ উঠে ঐ আলেমের কাছে গেলাম।

আমি যখন তার সাক্ষাত পেলাম তিনি ধর্মের মূলভিত্তিগুলো সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন এবং আমার পূর্ণ সন্তুষ্টি অনুযায়ী তিনি সেগুলো প্রমাণ করলেন। এরপর তিনি আমাকে পরদিন আবার তার কাছে যাওয়ার জন্য বললেন। বেশ কিছুদিন আমি এভাবে প্রতিদিন তার কাছে গেলাম। প্রতিদিন যখন আমি তার সাক্ষাতে গিয়েছি, তিনি আমাকে আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এত বিষদ বর্ণনা দিলেন যা আমি ছাড়া আর কেউ তা জানতো না।

এভাবে অনেক সময় চলে গেল। একদিন আমার বন্ধুরা আমাকে চাপাচাপি করলো তাদের একটা পার্টিতে যাবার জন্য। সেখানে আমাকে জুয়া খেলায়ও অংশ নিতে হবে। পরের দিন যখন আমি সেই আলেমের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম তিনি বললেন "তোমার লজ্জা করে না? তুমি কিভাবে এত বড় একটি গুনাহ করলে?" -আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি আমার দোষ স্বীকার করলাম এবং বললাম, আমি দুঃখিত। তিনি বললেন, "তওবার জন্য একটি গোসল কর এবং আর একাজ করো না।" এরপর তিনি অন্যান্য আরো কিছু নির্দেশনা দিলেন। এভাবে তিনি আমার জীবন ধারাই বদলে দিলেন। এগুলো সব ঘটেছিলো যানযানে। পরে যখন আমি তেহরান যাচ্ছিলাম তিনি আমাকে সেখানকার কিছু আলেমের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বললেন। সবশেষে তিনি আমাকে পবিত্র স্থানসমূহ দর্শনে যেতে বললেন। এখন আমি সেই ভ্রমণে আছি যা তিনি আমাকে করতে বলেছিলেন।

আমার বন্ধু বললো: "আমরা যখন ইরাকের কাছাকাছি এলাম আমি আবার সেই যুবককে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করায় সে বললো- আবু আব্দুল্লাহ্ (ইমাম হুসেইন-আঃ) আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হলো দেখাবার জন্য যে, যে কেউ আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র কাছে হেদায়েত চায়, তার সে উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে। এমনও যদি হয় সে একত্ববাদের বিষয়ে সন্দিহান, তবুও সে হেদায়েত লাভ করবে।

এ স্তরটি সফলতার সাথে সম্পূর্ণ করে সালিকের উচিত বড় ইসলাম ও বড় ঈমান অর্জনের জন্য সংগ্রাম করা, এ বিষয়ে প্রথম কাজ হলো ইসলামী আইনগুলো সম্পর্কে জানা । এ জ্ঞান একজন যোগ্য ফকীহর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। আইনের জ্ঞান অর্জনের পরই আছে তার অনুসরণের বিষয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত জরুরী, কারণ জ্ঞান হচ্ছে কাজের উৎসাহ এবং কাজ নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্ম দেয়। যদি কোন ব্যক্তি তার জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে, তাহলে সে সেই অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। যদি সে তা না করে তাহলে বোঝা যাবে সে তার জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয় এবং তাই তার জ্ঞান ও বিশ্বাস একটি অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন মানুষ আল্লাহ্ একমাত্র রিয্‌কদাতা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকে তাহলে সে কখনোই যে কোন ভাবে অর্থ উপার্জনে মরিয়া হবে না। ইসলামী আইন-কানুন যতটুকু তাকে অনুমতি দেয় তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট

থাকবে এবং প্রশান্তি সহ সে তার ও তার পরিবারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উপার্জন করবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সব সময় তার রিয্‌ক নিয়ে চিন্তিত থাকে এর অর্থ হচ্ছে সে আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র রিয্‌কদানে বিশ্বাস করে না অথবা বিশ্বাস করে যে তার কঠোর পরিশ্রমের সাথে তা শর্তযুক্ত অথবা সে বিশ্বাস করে রিয্‌ক নগদ অর্থ ও বেতনেই সীমাবদ্ধ। এটিই বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞান হচ্ছে কাজের উৎসাহ। নীচের উদাহরণটি প্রমাণ করে কিভাবে কাজ জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে। যখন কোন ব্যক্তি তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলে ঃ "গৌরব ও প্রশংসা আমার প্রতিপালকের জন্য যিনি সর্বোচ্চ", সে তার অসহায়ত্ব ও দূর্বলতা স্বীকার করে। স্বাভাবিকভাবেই শক্তি ও গৌরব বোঝা যায় না যদি দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকে।

উল্টো দিক থেকে ভাবলে, কেউ শক্তিহীন হতে পারে না যদি না কেউ একজন শক্তিশালী থাকে। অতএব ব্যক্তির মন সিজদায় যখন বলে ঃ "গৌরব এবং প্রশংসা আমার প্রতিপালকের যিনি সর্বোচ্চ", তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই পরম শক্তি এবং গৌরবময় আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হয়। কাজ জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে। কোরআনের আয়াত ঃ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ...﴾

"ভাল কাজ, একে তিনি উপরে উঠান।" (সূরা ফাতির ঃ ১০)

এটি অত্যন্ত জরুরী যে, সালিক তার সম্ভব সবটুকু চেষ্টা করবে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো মেনে চলতে এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকতে। কারণ ইসলামী আইন-কানুন বিরোধী কোন কিছু করা তার আধ্যাত্মিক সফরের লক্ষ্যের পরিপন্থী। প্রশংসনীয় কাজ করা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন কোন কাজে আসবে না, যদি হৃদয় এবং আত্মা দুষণযুক্ত থাকে। যেমন যদি কোন দেহ ময়লা থাকে, তাহলে তাতে প্রসাধনী প্রয়োগ করে কোন লাভ নেই। ওয়াজিব পালনে যত্নবান হওয়া এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সালিকের উচিত আরো প্রশংসনীয় কাজে আগ্রহী হওয়া এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ বড় ইসলাম এবং বড় ঈমান অর্জনে তাই করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক কাজের একটি প্রতিফল রয়েছে এবং তা ঈমান পূর্ণ করতে সাহায্য করে। মুহাম্মদ বিন মুসলিম থেকে এ হাদীসটি এ কথাই বলে ঃ "বিশ্বাস কাজের উপর

নির্ভর করে, কারণ কাজ বিশ্বাসের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, ভাল কাজ ছাড়া বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না"।

অতএব সালিক প্রত্যেক প্রশংসনীয় কাজ করবে কমপক্ষে একবার, যেন সে বিশ্বাসের ঐ অংশ অর্জন করে যা ঐ বিশেষ ধরনের কাজের উপর নির্ভর করে। ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন কাজ পূর্ণ ঈমান তৈরি করে। অতএব এটি জরুরী যে, সালিক প্রশংসনীয় কাজগুলো উপেক্ষা করবে না যখন সে বড় ঈমানের স্তরের দিকে এগোচ্ছে। কেননা তাতে তার ঈমান অসম্পূর্ণ থাকবে ঐ অনুযায়ী, যতটুকু সে ভাল কাজে উৎসাহী ছিল না। কোন আশেক যদি তার জিহ্‌বাকে এবং তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পবিত্র করে কিন্তু টাকা পয়সা ব্যয়ের সময় যদি সে তার দায়িত্বে অবহেলা করে, তাহলে তার বিশ্বাস পূর্ণতা পাবে না। প্রত্যেক শারীরিক অঙ্গকে বিশ্বাসের ঐ অংশটি পেতে হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত। হৃদয় হচ্ছে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্দার, তাকে আল্লাহর নাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ স্মরণে এবং মানুষের ভেতরে ও মহাজগতের মাঝে খোদায়ী নিদর্শনগুলো নিয়ে ভাবনায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

এভাবেই মানুষের ক্বলব ঈমানের রূহকে আত্মস্থ করে। কোরআন বলে ঃ

أَلَا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

"মনে রেখো আল্লাহকে মনে রাখার মাধ্যমে ক্বলবগুলো সন্তুষ্ট হয়।"

(সূরা রা'আদ ঃ ২৮)

যখন প্রত্যেক অঙ্গ বিশ্বাসের বিষয়ে এর জন্য নির্ধারিত অংশটুকু অর্জন করে, তখন আশেকের উচিত বড় ইসলাম ও বড় ইমানের স্তর সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক চেষ্টাকে বৃদ্ধি করা এবং বড় ইসলাম ও বড় ঈমানের স্তর সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে ইয়াক্বীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) এর রাজ্যে প্রবেশ করা।

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ

لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

"যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম দ্বারা অস্পষ্ট করে না, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত।" (সূরা আন'আম ঃ ৮২)

এর ফলে আধ্যাত্মিক অনুশীলনীর মাধ্যমে সালিক শুধু সঠিক পথের উপরেই আসবে না বরং শয়তানের আক্রমণ থেকেও নিরাপদ থাকবে।

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿﴾

"মনে রেখো আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয় নেই। তারা দুঃখও করবে না।"

(সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

এখানে 'ভয়' হচ্ছে আসন্ন বিপদ বা খারাপের আশংকা যা দুঃশ্চিন্তার কারণ। 'দুঃখ' হচ্ছে মানসিক দুর্দশা যা কোন খারাপ ও অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে ঘটে থাকে। সালিকের না থাকে কোন ভয়, আর না থাকে কোন দুঃখ; কারণ সে তার সকল বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যাস্ত করে। তার আল্লাহ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ ধরনের লোকেরা যখন ইয়াক্বীনের (নিশ্চিত বিশ্বাস) রাজ্যে প্রবেশ করে তখন তাদেরকে আল্লাহ তাঁর বন্ধু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলী (আঃ) এ স্তরকে ইঙ্গিত করেছেন যখন তিনি বলেছেন ঃ "সে আল্লাহর রাস্তাকেই দেখে, তাঁর রাস্তায় হাঁটে, তাঁর চিহ্নগুলো জানে এবং বাধাগুলো অতিক্রম করে। সে ইয়াক্বীনের এমনই এক স্তরে রয়েছে যে মনে হয় সে সব কিছু সূর্যের আলোয় দেখছে।"

ইমাম আলী (আঃ) আরো বলেছেন ঃ "জ্ঞান তাদেরকে সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে; তারা দৃঢ় বিশ্বাসের রুহকে ধারণ করেছে। তারা ঐগুলোকে সহজ মনে করে যা আরাম ও জৌলুসের ভেতর বসবাসকারীরা কঠিন বলে ভাবে। তারা এগুলোর সাথে পরিচিত যেগুলো মুর্খরা অপছন্দ করে; তাদের দেহগুলো পৃথিবীতে কিন্তু তাদের আত্মা উঁচু আসমানে।"

এ স্তরে অবলোকন ও এলহামের দরজাকে সালেকের সম্মুখে খুলে দেয়া হয়।

পরিস্কারভাবেই সালিকের এ সকল স্তর ভেদ করে যাওয়া ও তার এ পৃথিবীর নূন্যতম প্রয়োজনগুলো মেটানোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তার বাতেনী (ভেতরের) অভিজ্ঞতার সাথে তার যাহেরী (প্রকাশ্য) কাজ কর্মের কোন সম্পর্ক নেই, যেমন, বিয়ে, জীবন ধারণের জন্য উপার্জন এবং ব্যবসা ও চাষে নিয়োজিত থাকা। সালিক এ অনাকর্ষণীয় পৃথিবীতে শারীরিকভাবে বসবাস করে এবং কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তার আত্মা ফেরেশতাদের দুনিয়ার চারদিকে ঘুরে এবং

এর অধিবাসীদের সাথে কথা বলে। সে একজন শোকগ্রস্ত মানুষের মত যার কোন নিকটাত্মীয় খানিক আগে মৃত্যুবরণ করেছে। সে মানুষের ভেতর বাস করে, তাদের সাথে কথা বলে, বিভিন্ন জায়গায় হেঁটে যায়, খায় এবং ঘুমায় কিন্তু তার হৃদয় সবসময় তার আত্মীয়র কথা স্মরণ করে কাঁদে। যে-ই তার দিকে তাকায়, বুঝতে পারে যে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আছে। একইভাবে একজন সালিক তার প্রকৃতিগত প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে তার যোগাযোগ বজায় রাখে। ভালোবাসার একটি আগুন তার অন্তরে সব সময় জ্বলছে। বিরহের বেদনা তাকে অস্থির রাখে কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তার ভিতরের অবস্থা, যদিও যারা তাকিয়ে থাকে তারা সাধারণভাবে বুঝতে পারে আল্লাহর ভালোবাসা তার উপরে নেমে এসেছে।

এ ব্যাখ্যা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইমামদের বিলাপ, ফুঁপিয়ে কাঁদা এবং প্রার্থনা কোন ভনিতা ছিলো না। এমনকি দোয়াগুলোও যেগুলো তাদের মাধ্যমে এসেছে, শুধু নির্দেশনার জন্য ছিলো না। এ ধরনের মনোভাব সত্য না জানার উপর ভিত্তি করে এসেছে। এটি ইমামদের মর্যাদার জন্য হানিকর যে তারা অবাস্তব কিছু বলবে অথবা আল্লাহর প্রতি মানুষকে ডাকবে নকল দোয়ার মাধ্যমে। এটি কি বলা ঠিক হবে যে, ইমাম আলী ও যায়নুল আবেদীন (আঃ)-দের হৃদয় বিদারক বিলাপগুলো ছিলো নকল এবং এর কোন বাস্তবতা ছিলো না এবং শুধুই ছিলো শিক্ষার জন্য? একেবারেই না। ধর্মের নেতা এ দলটি নিজ সত্তা থেকে ফানাহর পর্যায় পর্যন্ত অর্জন করেছেন এবং আল্লাহতে বসবাসের পর্যায়ে পৌঁছেছেন আধ্যাত্মিকতার সবগুলো স্তর অতিক্রম করে এবং এভাবে তারা তাদের নিজেদের ভিতরে একত্র করেছেন তাওহীদের পৃথিবীর গুণাবলী ও বহুত্বের পৃথিবীকে। তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদায়ী নূর লাভ করেছেন এবং তারা বাধ্য থাকেন উর্ধ্বজগতের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখা এবং ঐ জগতের কোন আইন সামান্যতম ভঙ্গ না করার জন্য।

যখন সালিক উপরের সমস্ত পৃথিবীগুলো সফল ভাবে অতিক্রম করে এবং শয়তানের উপর বিজয়ী হয়, সে জয় এবং বিজয়ের পৃথিবীতে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যেই সে বস্তুজগত অতিক্রম করে আত্মার জগতে প্রবেশ করে থাকবে। এখন থেকে তার এ মহাযাত্রা ফেরেশতাদের জগত এবং আত্মার জগতের ভেতর দিয়ে ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হবে আল্লাহর সাত্তিক যাত-এ (আলামে লাহুত) প্রবেশ করতে।

চতুর্থ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনের নিয়মাবলী

আধ্যাত্মিকতার পথে এগোবার জন্য এটি জরুরী যে, সালিক একজন সালেহ ব্যক্তিকে তার উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করবে। উস্তাদকে অবশ্যই নিজ সত্তা থেকে বিলীন হয়ে আল্লাহতে বাক্বার মাক্বামে অবস্থানকারী হতে হবে। সালিকের জন্য সুবিধাজনক এবং তার জন্য ক্ষতিকর এমন সব বিষয় তার ভালোভাবে জানা থাকতে হবে এবং অন্য সালিকদের প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা তার থাকতে হবে। এছাড়াও স্মরণ এবং আল্লাহর যিকির এবং বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনাও সালিকের জন্য জরুরী।

এ ছাড়াও আধ্যাত্মিক পথের সবগুলো স্তর পার হবার জন্য সালিকের জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরীঃ

রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক নিয়ম-কানুন পরিত্যাগ করা ঃ

এর অর্থ যেসব নিয়ম-কানুন সমাজিক রীতি অথবা ভাষার ব্যবহার জৌলুস জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কিত এবং যেগুলো সালিকের পথে একটি বাধা সেগুলো তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে মানুষের ভেতর বাস করেই একটি সাধারণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে হবে। কিছু লোক সামাজিক রীতি-নীতির ভিতরে এমনভাবে ডুবে আছে যে তারা সব সময় খুব যত্ন সহকারে তা পালন করে যেন সমাজে তাদের মর্যাদা বজায় থাকে এবং প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় এবং এমনকি ক্ষতিকর আচার-ব্যবহার মেনে চলে যা অসুবিধা ও দুঃশ্চিন্তার কারণ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। তারা অপ্রয়োজনীয় রীতি পদ্ধতিকে বাস্তব ও জরুরী প্রয়োজনের উপর স্থান দেয়। তাদের কাছে কী সঠিক এবং কী বেঠিক এটি নির্ণয়ের মাপকাঠি হচ্ছে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও আপত্তি। তাদের নিজের কোন অভিমত নেই এবং যা সাধারণভাবে চলছে তাই তারা অনুসরণ করে। অন্য দিকে কিছু লোক আছে যারা একাকী জীবন যাপন করে এবং সমাজের সমস্ত নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে

এবং এভাবে তারা নিজেদেরকে সমাজের কল্যাণসমূহ থেকে বঞ্চিত রাখে। তারা অন্যদের সাথে মেলামেশা করেনা এবং তারা নিরাশাবাদী হিসাবে পরিচিত হয়।

সালিকের উচিত তার উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য মধ্যপথ অবলম্বন করা। তার উচিত লোকজনের সাথে মেলামেশা করা। বেশীও নয় আবার খুব কমও নয়। এটি কোন বিষয় নয় যদি সে ভিন্ন সামাজিক আচরণের জন্য অন্যদের চাইতে দেখতে আলাদা হয়। সে অন্যকে অনুসরণ করবে না এবং এ ব্যাপারে অন্যের সমালোচনাকেও গুরুত্ব দেবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ...﴾

"আল্লাহর রাস্তায় তারা কোন সমালোচককে ভয় করে না।"

(সূরা মায়েদা ঃ ৫৪)

এর অর্থ হচ্ছে, একজন সত্যিকার বিশ্বাসী সেগুলোর সাথেই লেগে থাকে যা সে সঠিক বলে মনে করে। নীতিগতভাবে বলা যায় একজন সালিকের উচিত প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে ওজন করা এবং তার উচিত নয় অন্য লোকের ইচ্ছা অনুসরণ করা অথবা তাদের মতামত অন্ধের মত অনুসরণ করা।

দৃঢ়তা (*আ'জাম*) ঃ

যখনই সালিক তার আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করে, তখন থেকেই সে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। তার বন্ধু পরিচিতরা তার সমালোচনা করে যারা শুধু তাদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য এবং চলমান সামাজিক রীতিনীতিতে আগ্রহী। তারা সালিককে টিটকারী দেয় এবং খুঁত ধরে তার আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য এবং তার উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য। যখন এসব দুনিয়া-প্রেমী লোকেরা দেখে যে সালিকের জীবনে একটি নতুন ধারা এসেছে এবং তার পদ্ধতি ও আচরণ তাদের চাইতে ভিন্ন, তখন তারা রাগ করে এবং তারা সব রকমের চেষ্টা করে তাকে তার এ নুতন পছন্দ করা পথ থেকে মশকরা ও টিটকারীর মাধ্যমে সরিয়ে আনতে। তাই আশেক তার আধ্যাত্মিক সফরের প্রতিটি স্তরে নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হবে। তার সমাধান সে করতে পারে দৃঢ় মনোবল, অধ্যাবসায়, মানসিক শক্তি এবং আল্লাহতে আস্থার মাধ্যমে।

وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿﴾

"বিশ্বাসীরা আল্লাহতে তাদের আস্থা রাখুক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০)

দয়া ও ধৈর্য্য (*রিফক্ ওয়া মুদায়ারা*) ঃ

এটি হচ্ছে অনেক জরুরী নীতিমালার একটি যা সালিক অবশ্যই অনুসরণ করবে। কারণ সামান্য একটু উদাসীনতা এ বিষয়ে তার অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত করে না বরং এ নীতির প্রতি অমনোযোগীতার পরিণতিতে সে খোদ আধ্যাত্মিক সফরেই হতাশ হয়ে যেতে পারে। প্রথম দিকে সালিক অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখাতে পারে। মাঝামাঝি এসে সে খোদায়ী নূরের বিস্ময়কর প্রকাশ দেখতে পারে এবং পরিণতিতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তার বেশীর ভাগ সময়ই সে ব্যায় করবে ইবাদাতে এবং নিজেকে ব্যস্ত রাখবে দোয়া, বিলাপে ও কান্নায়। এভাবে সে চেষ্টা করতে পারে প্রত্যেক ভালো জিনিস নিতে এবং প্রত্যেক আধ্যাত্মিক খাবার থেকে এক লোকমা নিতে। কিন্তু এ অভ্যাস যে সবসময় উপকারী তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকরও। খুব বেশী চাপের মধ্যে সে বিরক্ত হয়ে যেতে পারে, কাজকে অসম্পূর্ণ রেখে তা পরিত্যাগ করতে পারে এবং প্রশংসনীয় কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। শুরুতে খুব বেশী উৎসাহ, শেষ দিকে খুব কম আগ্রহে পরিণত হতে পারে। অতএব, সালিক ক্ষণিকের উৎসাহে যেন ভ্রান্তিতে না পড়ে এবং তার ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ততটুক ভার বইবে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব অথবা তার চেয়েও কম। যেহেতু সে নিশ্চিত এতে যথাযথ আগ্রহ বজায় রেখে সে স্থায়ী ভাবে বইতে পারবে। তার উচিত ইবাদাত করা যখন সে সত্যিকারভাবে এর দিকে ঝুঁকে আছে এবং তা থেকে সরে আসবে যখন তা সম্পাদন করার আগ্রহ তখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি।

তাকে তুলনা করা যেতে পারে এমন লোকের সাথে যে কিছু খেতে চায়। এ মানুষটির উচিত প্রথম একটি খাবার পছন্দ করা যা তার রুচি সম্মত এবং এরপর তা খাবে তার পেট ভরে যাবার আগ পর্যন্ত। ভারসাম্যের এ নীতি একটি হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) আব্দুল আযীয কারাতিসীকে বলেছেন ঃ "আব্দুল আযীয, বিশ্বাসের দশটি স্তর রয়েছে মই-এর ধাপগুলোর মত, যেগুলো একটি একটি করে বেয়ে উঠতে হয়। যদি

তুমি কাউকে একটি ধাপ নীচে পাও তাহলে আস্তে করে তাকে তোমার কাছে তুলে নাও এবং যা সে বইতে পারবে না সেই বোঝা তাকে দিও না, নয়তো তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে"।

এ হাদীসটি প্রমাণ করে নীতিগতভাবে ঐসব ইবাদাতই শুধু উপকারী যা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে করা হয়। ইমাম সাদিক (আঃ) এর এ হাদীসটিও তাই প্রমাণ করে: "ইবাদাত করতে নিজেকে বাধ্য করো না"।

আনুগত্য (*ওয়াফা*) ঃ

এর অর্থ হচ্ছে একটি গুনাহর বিষয়ে অনুতপ্ত হওয়া ও আল্লাহর কাছে এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তা অবশ্যই আবার না করা। প্রত্যেক অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে এবং ধর্মপরায়ণ উস্তাদের নিকট প্রত্যেকটি ওয়াদা রক্ষা করতে হবে।

নিরবচ্ছিন্নতা (*সুবাত ওয়া দাওয়াম্*) ঃ

এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য করা প্রয়োজন। কোরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীস প্রমাণ করে, যা কিছু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি, যা আমরা করি এবং যা কিছু অস্তিত্বশীল এবং যা ঘটে তার সাথে সম্পর্কিত একটি সত্য রয়েছে যা এ বস্তুগত ও শরীরী পৃথিবীর উর্ধ্বে এবং তা সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার অধীন নয়। যখন এ সত্যগুলো বস্তুজগতে অবতরণ করে তখন তারা একটি বস্তুগত এবং বোধগম্য আকৃতি ধারণ করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে ঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿﴾

"এমন কিছুই নেই যার ভান্ডার আমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি জিনিস নাযিল করি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়।" (সূরা হিজর ঃ ২১)

এ আয়াতে এটিই বোঝায় যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার বস্তুগত অস্তিত্বের আগে একটি অস্তিত্ব ছিলো যার কোন পরিমাণ ও মাপ ছিলো না। যখন আল্লাহ কোন জিনিস এ পৃথিবীতে পাঠাতে চান তিনি এর মাত্রা নির্ধারণ করেন, অতএব তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় ঃ

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿﴾

"কোন দুর্যোগ এ পৃথিবীতে ও তোমাদের উপর আসে না যা আসার আগে তা একটি কিতাবে ছিলো না, নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য তা সহজ।"

(সূরা হাদীদ ঃ ২২)

যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের বাহ্যিক আকার নির্ধারিত এবং সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যেক জিনিস পরিবর্তনশীল যা বস্তুর বৈশিষ্ট্য, যেমন আকারে আবির্ভূত হওয়া এবং আকার বিকৃত হওয়া। এ পৃথিবীর সবকিছু অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষয়িষ্ণু। আল্লাহ বলেন ঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ...﴿﴾

"যা কিছু তোমাদের সাথে রয়েছে তা বিলীন হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাথে যা কিছু আছে তা থাকবে।" (সূরা নাহল ঃ ৯৬)

অন্য কথায়, নিরাকার সত্যসমূহ বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের অধীন নয় এবং তাদের ভান্ডার আল্লাহর সাথে রয়েছে, আর তা কখনও নিঃশেষ হয় না। নীচের হাদীসটি শীয়া ও সুন্নী উভয়েই এ সূত্রে গ্রহণ করেছে এবং এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঃ "আমরা নবীরা নির্দেশিত হয়েছি যেন আমরা জনগণের সাথে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলি।"

এ হাদিসটি সত্যসমূহের বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত, তাদের সংখ্যার সাথে নয়। এটি বলছে নবীরা উচ্চতর সত্যসমূহকে সহজ করতেন এবং তা বোধগম্য করে যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তাদের কাছে বর্ণনা করতেন। মানুষ এ পৃথিবীর চাকচিক্যে বিমোহিত হয়ে যাওয়াতে এবং ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত থাকার কারণে নিস্প্রভ এবং মরিচাবৃত হয়ে পড়েছে এবং সত্যসমূহের বাস্তবতা অনুধাবনে সক্ষম হয় না। নবীদেরকে এমন একজন লোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যে শিশুদের কাছে কোন সত্যকে ব্যাখ্যা করতে চায়। স্বাভাবিক ভাবেই তাকে তা এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে যা শিশুদের বোঝার শক্তি ও

পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনুযায়ী হবে। এ একই নিয়ম নবীদের বেলায়ও প্রযোজ্য যারা আসমানী শিক্ষার রক্ষণাবেক্ষণকারী। মাঝে মাঝে তারা জীবন্ত সত্যসমূহকে এমন ভাবে বর্ণনা করেন যেন মনে হয় সেগুলো জীবনহীন। অথচ এমনকি যাহেরী কাজ, যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, খুম্‌স, ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ থেকে বিরত থাকা এসবই জীবিত এবং চেতনা সম্পন্ন সত্য।

সালিক হলো সেই লোক যে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার সত্তাকে এবং বুদ্ধিকে সব রকম অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে চায়, যেন সে আল্লাহর অনুগ্রহে উচ্চতর সত্যসমূহকে অবলোকন করতে পারে এ জীবনেই এবং এ পৃথিবীতেই। এটি প্রায়ই ঘটে যে আশেক অযু ও নামাযকে তাদের বাস্তব আকারে দেখে এবং চেতনা ও অনুভূতির দৃষ্টিতে অনুভব করে যে তাদের বাস্তব আকার তাদের শারীরিক আকারের চাইতে হাজার গুন উত্তম।

যেসব বর্ণনা ইমামদের কাছ থেকে আমাদের কাছে নেমে এসেছে সেগুলো দেখায় যে, ইবাদাতসমূহ পুনরুত্থান দিবসে তাদের যথাযথ আকারে উপস্থিত হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে। এমনকি কোরআনেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐদিন মানুষের কান, চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কথা বলবে।

একইভাবে মসজিদগুলো যা দেখতে মনে হয় ইট আর খুঁটি দিয়ে তৈরী, এদেরও জীবন্ত ও চেতনাসম্পন্ন বাস্তবতা রয়েছে। এজন্যই কিছু হাদীস বলে কিয়ামতের দিন মসজিদগুলো ও পবিত্র কোরআন তাদের প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করবে। একদিন এক সাধক তার বিছানায় শুয়ে ছিলেন। যখন তিনি এক কাত থেকে আরেক কাতে শুলেন তিনি একটি আর্তনাদকে মাটি থেকে বেরিয়ে আসতে শুনলেন। তিনি সাথে সাথে এর কোন কারণ বুঝতে পারলেন না। পরবর্তীতে তিনি হয় নিজেই তা বুঝতে পেরেছেন অথবা অন্য কেউ তা তার কাছে তুলে ধরেছেন যে মাটি তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটার কারণে আর্তনাদ করে উঠেছিলো।

প্রাথমিক এ মন্তব্যগুলোর পর আমরা প্রধান বিষয়ে আসি। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে সালিকের উচিত প্রত্যেক ইবাদাত, যা সে করে তার একটি অদৃশ্য আকার তার মনে গেঁথে নেয়া, যেন তার এ অনুশীলন স্থায়ী একটি

স্বভাবে পরিণত হয়। তার উচিত প্রত্যেকটি কাজ বার বার করা এবং যতক্ষণ না সে তা করায় আনন্দ লাভ করে ততক্ষণ তা ছেড়ে দিবে না। কোন কাজের স্থায়ী ফেরেশতার মতো চেহারাটি সে দেখতে পাবে না যদি সে লম্বা একটি সময়ের জন্য তা না করে। যাতে তার মন থেকে এর ছবি মুছে না যায়। এ কারণে তার একটি কাজ পছন্দ করা উচিত যেটি তার ঝোঁক এবং মেধা অনুযায়ী হবে এবং তা নিয়মিত করবে, কারণ যদি কোন কাজ অপরিণত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে শুধু এর ভালো প্রতিফলগুলোই যে মুছে যাবে তা নয় বরং একটি খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করবে। যেহেতু একটি ভালো কাজ হচ্ছে জ্যোতির্ময়, একে ছেড়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া হবে অন্ধকার এবং খারাপ। প্রকৃত অবস্থা হলো এ যে, "আল্লাহর কাছে ভালো ছাড়া কিছু নেই এবং যত খারাপ, দুষ্কর্ম এবং অন্যায় তা আমাদের দোষ।" অতএব, মানুষ সকল দোষ ও ত্রুটির জন্য দায়ী।

"হে আমার রব খারাপ আপনার দিক থেকে হতে পারে না"। এটি দেখায় আল্লাহর অনুগ্রহ সবার প্রতি। এটি কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য সুবিধা নয়।

আল্লাহর অসীম দয়া সব মানুষের জন্য। হোক সে মুসলিম, ইহুদী, খৃষ্টান, যোরস্ত্রীয় অথবা মূর্তিপূজক। কিন্তু কিছু মানুষ তাদের কিছু অন্যায় কাজের জন্য কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করে যা তাদেরকে অসুখী বানায় এবং তাই আল্লাহর রহমত কিছু মানুষকে সুখী এবং কিছু মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত করে।

ক্রমাগত ধ্যান *(মোরাক্বাবাহ)* ঃ

এর অর্থ হচ্ছে সালিক কোন সময়ই তার দায়িত্ব ভুলে যাবে না এবং অবশ্যই যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে তা পালন করে চলবে।

মোরাক্বাবাহ বা পর্যালোচনামূলক ধ্যান-এর অর্থ ব্যাপক এবং এর অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় আধ্যাত্মিক ভ্রমণের মাত্রা ও স্তর অনুযায়ী। প্রথম দিকে এর অর্থ হলো এ পৃথিবীতে ও আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। ধীরে ধীরে এ মোরাক্বাবাহ কঠিনতর ও উচ্চতর হতে থাকে। কোন কোন সময় কারো নিরবতা বা নিজ সত্তার উপর বা কোন উচ্চতর সত্য যেমন, আল্লাহর নামসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের বিষয়ে মনোযোগ দেয়া। এ ধরনের মোরাক্বাবাহর মাত্রা ও স্তর সম্পর্কে পরে উল্লেখ করবো।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মোরাক্বাবাহ আধ্যাত্মিক সফরের একটি জরুরী শর্ত। শীর্ষস্থানীয় সাধকরা এর উপরে অনেক জোর দিয়েছেন এবং একে আধ্যাত্মিক সফরের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে বর্ণনা করেছেন যার উপরে আল্লাহর স্মরণ (*যিকির*) ও গভীর চিন্তার (*ফিক্‌র*) মিনার দাঁড়িয়ে থাকে। মোরাক্বাবাহ ছাড়া আল্লাহর স্মরণ ও গভীর চিন্তা কোন ভালো ফল দিবে না। সালেকের জন্য মোরাক্বাবাহ ঐ রকম জরুরী যেমন রোগীর জন্য ডাক্তার নির্দেশিত পথ্য। যা না হলে ঔষধ অকার্যকরী হতে পারে। এমনকি উল্টো ফলও বয়ে আনতে পারে। এজন্য সুবিখ্যাত আধ্যাত্মিক অভিভাবকগণ কোন তাসবীহ ও আল্লাহর ফিকির দেন না মোরাক্বাবাহ ছাড়া।

আত্মমূল্যায়ন করা (*মুহাসাবাহ*) ঃ

সালিকের উচিত প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় রাখা যখন গত চব্বিশ ঘন্টায় তার সম্পাদিত সব কাজকে পুনঃপরীক্ষা ও পর্যালোচনা করবে। এ পুনঃপরীক্ষার অনুশীলনটি ইমাম মূসা ইবনে জাফরের (আঃ) কথা থেকে নেয়া হয়েছে ঃ "যে প্রতিদিন একবার তার নিজের হিসাব নেয় না, সে আমাদের একজন নয়"। পুনঃপরীক্ষার সময় সালিক যদি দেখে সে তার দায়িত্ব পালন করে নি, তার উচিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং সে যদি দেখে যে, সে সব বিষয়ে তার দায়িত্ব পালন করেছে, তাহলে তার উচিত তার (আল্লাহর) কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া।

শাস্তি (*মুয়াখ্‌খাজাহ্‌*) ঃ

যদি সালিক দেখে যে সে কোন গাফিলতি ও ভুলে দোষী তাহলে তার উচিত নিজেকে তিরস্কার অথবা শাস্তি দেয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া।

দ্রুত এগিয়ে যাওয়া (*মুসারায়াত্‌*) ঃ

সালিকের উচিত তার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। যেহেতু এ পথে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে, তার উচিত সতর্ক ও সাবধান থাকা এবং তার উদ্দেশ্য অর্জনে এক মুহূর্তও নষ্ট না করা।

গভীর অনুরক্তি ও নির্ভরতা (*ইরাদাত*)ঃ

সালিকের অবশ্যই রাসূল (সাঃ) ও তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে সে এতটা আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে যে

তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র না থাকে। এ পর্যায়ে ভালোবাসা যত গভীর হবে, দ্বীনি কাজের প্রভাব তার অন্তরে তত বেশী হবে।

যেহেতু সব অস্তিত্বশীল জিনিস আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাই সালিক অবশ্যই তাদেরকে ভালবাসবে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী। একজন আল্লাহ্‌র আশেক (প্রেমিক) সমস্ত মানুষ ও জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। একটি হাদীস অনুযায়ী সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের একটি অংশ। অন্য একটি হাদীস বলে ঃ

"আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে আপনার ভালবাসা এবং যে আপনাকে ভালবাসে তার ভালবাসা চাই।"

সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম পালন করে চলা (*আদাব*):

মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করা যা উপরে উল্লেখিত গভীর অনুরক্তি ও নির্ভরতা (*ইরাদাত*) থেকে আলাদা। এখানে সম্মান প্রদর্শন অর্থ সতর্ক থাকা যেন কেউ নিজের সীমা অতিক্রম না করে এবং আল্লাহ্‌র দাসত্বে যা প্রয়োজন তার সাথে মিল নেই এমন কিছু না করে। এটি মানুষের জন্য প্রয়োজন যে সে তার ও তার সৃষ্টিকর্তার সীমা অতিক্রম করবে না। এ সম্মান প্রদর্শন বহুত্বের পৃথিবীর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু গভীর অনুরক্তি ও নির্ভরতার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

গভীর অনুরক্তি(*ইরাদাত*) ও সম্মান প্রদর্শন(*আদাব*) পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেভাবে শরিয়াতে একটি ওয়াজিব কাজ এবং একটি হারাম কাজ সম্পর্কযুক্ত। একটি ওয়াজিব কাজ করার সময় আশেক আল্লাহ্‌র দিকে তাকায়, আর হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার সময় সে নিজের সীমাবদ্ধতার দিকে তাকায়, না জানি সে তা আবার লংঘন করে বসে। সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে ভয় ও আশার মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করা। এ নীতি পালন না করলে ভারসাম্যের সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা থাকে বেশী, যা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত।

মরহুম হাজী মির্যা আলী আল ক্বাযী ছিলেন আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন হাসিখুশী এবং অন্তরে ছিলো ভয়ের জায়গায় বিশ্বাস। একই অবস্থা ছিল মরহুম হাজী শেইখ মোহাম্মদ বাহারের ক্ষেত্রেও। আবার উল্টো ছিল হাজী মির্যা জাওয়াদ আল মালিকির বৈশিষ্ট্য। তার ছিল আশা ও

হাসিখুশীর জায়গায় ভয়। তাদের কথাতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধকদের ভাষায়, যে হাসিখুশী থাকে তাকে বলা হয় মাতাল এবং যে ভয়ে জর্জরিত থাকে তাকে বলা হয় বেহালা বাদক। সর্বোত্তম হচ্ছে এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করা। অন্য কথায়, একজন আশেকের উচিত একই সময়ে এ দু'গুণের উচ্চাবস্থায় থাকা। শুধু ইমামদের বেলায় এ দুইয়ের সর্বোত্তম অবস্থা দেখা যায়।

সংক্ষেপে, একটি সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল সত্তা হিসেবে মানুষের উচিত নয় তার নিজের সীমাবদ্ধতা ভুলে যাওয়া। তাই ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) যখনই কেউ তার বিষয়ে চরম কিছু বলতো তিনি মাটিতে সিজদা দিতেন।

পূর্ণ দায়িত্ববান আশেক হচ্ছে সে, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে সবসময় যেমন- কথা বলার সময়, চুপ থাকায়, খাবার খাওয়ায়, পান করায়, ঘুমাবার সময়ে উপস্থিত মনে করে এবং ঔচিত্যের সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে।

যদি আশেক তার (আল্লাহ্‌র) নামসমূহ, গুণাবলীসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ মনে রাখে, তাহলে সে সম্মান প্রদর্শনের সব নিয়ম মেনে চলবে এবং সব সময় নিজের দুর্বল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

উত্তম ইচ্ছা (*নিয়ত*) ঃ

এর অর্থ হচ্ছে সালিককে একাগ্রচিত্ত ও ভাল নিয়তের অধিকারী হতে হবে। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে যাওয়া। কোরআন বলে ঃ

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... ﴿﴾

"আল্লাহ্‌কে ডাকো একাগ্রচিত্তে, আনুগত্যকে তাঁরই জন্য রেখে।"

(সূরা মুমিন ঃ ১৪)

কয়েকটি হাদীস আছে যাতে তিন স্তরের নিয়তের কথা রয়েছে। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন, "তিন ধরনের ইবাদাত রয়েছে। কেউ আছে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে, কারণ তারা তাকে ভয় পায়। তাদের ইবাদাত হচ্ছে দাসদের ইবাদাত। অন্যরা আছে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে এর পুরস্কারের আশায়। এদের ইবাদাত দিন-মজুরদের ইবাদাত। এরপর অন্যরা রয়েছে, যারা

আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে যেহেতু তারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসে। তাদের ইবাদাত মুক্ত মানুষের ইবাদাত।"

গভীরভাবে দেখলে এটি বুঝা যায় যে, এমন দুই ধরনের ইবাদাত আছে যা কোন ভাবেই ইবাদাত নয়। কারণ যারা এ ধরনের ইবাদাত করে প্রকৃত পক্ষে তারা আত্মপূজারী। তারা নিজ স্বার্থে উৎসাহিত হয়েছে। যেহেতু আত্মপূজারীরা আল্লাহ্‌র ইবাদাতকারী হতে পারে না তাদেরকে অবিশ্বাসী হিসাবেও ভাবা হতে পারে।

কোরআন আল্লাহ্‌র ইবাদাতকে মানুষের প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছে। একই সাথে মানুষের ভেতর জন্মগত যে গুণাবলী রয়েছে তার পরিবর্তন হবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿﴾

"দ্বীনের জন্য তোমার উদ্দেশ্যকে স্থির করো একজন মানুষ হিসাবে ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতি নিয়ে - যে প্রকৃতিতে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র তৈরি প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তনকারী নেই। এটিই হচ্ছে সঠিক ধর্ম, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই 'এ সত্যটি' জানেনা।" (সূরা রূম ঃ ৩০)

তাই ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন ইবাদাত আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বিচ্যুতিই শুধু নয়, বরং তাওহীদের রাস্তা থেকে বিচ্যুতি; কারণ এ স্বার্থান্বেষীরা আল্লাহ্‌র কাজে ও গুণাবলীতে তাঁর একত্বে বিশ্বাস করে না কেননা তারা অন্য কাউকে তার সাথে যুক্ত করে। কোরআন সমস্ত জায়গায় আল্লাহ্‌র একত্বকে ঘোষণা করেছে এবং তাঁর কোন সাথী বা অংশীদার অস্বীকার করেছে।

উপরে উল্লেখিত প্রথম দুই দল ইবাদতকারী আল্লাহকে তাদের উদ্দেশ্যের অংশীদার বিবেচনা করে এবং নিজেকে বড় ভাববার ধারণা থেকে

দূরে থাকে না, তাঁর ইবাদাতের সময়ও। তাদের দু'টো উদ্দেশ্য রয়েছে আর সেটিকেই শিরক বলা হয় এবং কোরআন অনুযায়ী তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ...﴿﴾

"আল্লাহ্ তার অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া তিনি সব ক্ষমা করেন যাকে তাঁর ইচ্ছা।" (সূরা নিসা ঃ ১১৬)

উপরের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে প্রথম দুই দলের ইবাদাত ফলদায়ক নয় এবং তা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করবে না।

আর তৃতীয় দলটি যারা ভালবাসার কারণে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তা হচ্ছে মুক্ত মানুষদের ইবাদত এবং একটি হাদীস অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। "এটি হচ্ছে একটি গোপন মর্যাদা যা শুধু পবিত্ররা অর্জন করে।" ভালবাসা হচ্ছে আকর্ষণ অথবা অন্য কথায় কোন ব্যক্তি বা কোন সত্য দ্বারা আকর্ষিত হওয়া।

তৃতীয় দলটি হচ্ছে তারা যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসে এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে। তাঁর নিকটবর্তী হওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে তাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদ 'মাশুক' এবং তারা তাঁর দিকে এগোতে চেষ্টা করে।

হাদীস বলে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা উচিত যেহেতু তিনি ইবাদাত লাভের যোগ্য। তাঁর গুণাবলীর জন্যই তিনি যোগ্যতা ও মূল্য রাখেন যে তাঁর ইবাদত করা হবে। অন্য কথায়, তাঁর ইবাদাত করতে হবে, যেহেতু তিনি আল্লাহ্।

ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ "হে আমার ইলাহ্, আমি আপনার ইবাদাত করি এজন্য নয় যে, আমি আপনার দোযখকে ভয় করি, আর না আমি আপনার বেহেশত চাই। আমি আপনার ইবাদাত করি যেহেতু আমি আপনাকে ইবাদাত করার যোগ্য পেয়েছি। আপনি নিজেই আমাকে আপনার কাছে পথ দেখিয়েছেন এবং আপনার কাছে আমাকে ডেকেছেন, আপনি যদি না হতেন তাহলে আমি জানতে পারতাম না আপনি কে।"

প্রথম দিকে সালিক সামনে এগিয়ে যায় ভালবাসার কারণে, কিন্তু কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে সে বুঝতে পারে ইশক (প্রেম) মাশুক এর চাইতে ভিন্ন। অতএব সে প্রেম ত্যাগ করার চেষ্টা করে যা তার এ পর্যন্ত অগ্রগতির মাধ্যম ছিল, কিন্তু তার পরবর্তী অগ্রগতির পথে তা বাধা প্রমাণিত হতে পারে। এখন সে সমস্ত মনোযোগ দেয় মাশুকের দিকে যার ইবাদাত সে করে তার মাশুক হিসাবে। এরপর সে কয়েক কদম এগিয়ে বুঝতে পারে যে এখনও তার ইবাদাত দ্বৈততা মুক্ত নয়, কারণ এখনও সে নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেমিক এবং আল্লাহকে মাশুক হিসাবে মনে করে, অথচ আল্লাহ্‌র পরম তাওহীদের সাথে এ চিন্তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, আল্লাহ্‌র একজন প্রেমিক রয়েছে। অতএব সালিক প্রেম সম্বন্ধে ভুলে যেতে চেষ্টা করে, যেন সে বহুত্বের জগত থেকে তাওহীদের জগতে প্রবেশ করতে পারে। এ পর্যায়ে তার ইচ্ছাশক্তি ও নিয়ত থেমে যায়, কারণ তার সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব ইতিমধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে।

এ স্তরের আগে সালিক অবলোকন, পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিশক্তির সন্ধান করছিলো। এখন সে এগুলোর সব ভুলে যায়, কারণ যখন তার কোন ইচ্ছা থাকে না তখন তার কোন আকাঙ্ক্ষাও থাকতে পারে না। এ অবস্থায় এটি বলা যায় না যে সালিকের চোখ ও হৃদয় কাজ করছে কি করছে না। দেখা ও না দেখা, জানা এবং না জানা সব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

বায়যীদ বোস্তামী সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি বলেছেন ঃ "প্রথমে আমি এ পৃথিবী পরিত্যাগ করলাম। পরদিন আমি আখেরাত পরিত্যাগ করলাম। তৃতীয় দিন আমি আল্লাহ্ ছাড়া সব পরিত্যাগ করলাম। চতুর্থ দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি কি চাই। আমি বললাম আমি চাই আমি যেন না চাই।" সম্ভবত: এ কথা থেকে কেউ ইঙ্গিত নিয়ে নীচের চারটি স্তর নির্দিষ্ট করেছে ঃ

১) এ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা, ২) আখেরাতকে পরিত্যাগ করা, ৩) আল্লাহ্ ছাড়া সব পরিত্যাগ করা, ৪) পরিত্যাগ করাও পরিত্যাগ করা। এটি একটি বিষয় যা ভালভাবে বোঝার জন্য গভীর বিবেচনা প্রয়োজন। এটিই হচ্ছে সেই স্তর যেখানে সালিক সকল আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে। এটি বিরাট সাফল্য, কিন্তু অর্জন কঠিন; এমন স্তরেও সালিক তার হৃদয়কে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা মুক্ত দেখতে পায় না। কমপক্ষে সে কামালিয়াত বা 'সম্পূর্ণতা' অর্জন করতে চায়। কোন আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগে সচেতন প্রচেষ্টাও লাভজনক নয়, কারণ এ ধরনের প্রচেষ্টাতেও আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য জড়িত আছে।

আমি একদিন আমার উস্তাদ মির্যা আলী ক্বাযীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তাকে এ বিষয়ের সমাধান কী তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন এটির সমাধান সম্ভব "পুড়ে যাওয়া" পদ্ধতির মাধ্যমে সালিকের উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ্ তাকে এমন ভাবে তৈরি করেছেন যে তার সব সময়ই আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশা থাকবে। এটি তার জন্মগত প্রকৃতির অংশ। যত চেষ্টাই সে করুক না কেন, সে সব আকাঙ্ক্ষা দূর করতে পারবে না। অতএব তার উচিত তার শক্তিহীনতা স্বীকার করে নেয়া এবং এ বিষয়ে সব প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা। এ পর্যায়ে সে তার বিষয়কে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করবে। এভাবে তার উপায়হীনতা এবং শক্তিহীনতার স্বীকৃতি তার কামনা-বাসনার শেকড়কে পুড়িয়ে ফেলবে ও তাকে পবিত্রই করবে।

যাহোক, অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে এ বিষয়টিতে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য সালিকের অবশ্যই একটি বিশেষ অবস্থা ও অন্তর্জ্ঞান প্রয়োজন। যদি কেউ একবার এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তাহলে সে বুঝতে পারবে এ পৃথিবীর সব কিছুর সাথে এর আনন্দের তীব্রতার কোন তুলনাই হতে পারে না। এ পদ্ধতিকে বলে 'পুড়ে যাওয়া' পদ্ধতি। কারণ তা ইচ্ছাশক্তি ও নিয়তের অস্তিত্বকে পুড়ে ফেলে এবং এগুলোকে শেকড়সহ বিদায় করে দেয়।

কোরআন এ পদ্ধতিকে কয়েকটি জায়গায় ব্যবহার করেছে। একটি হচ্ছে এ বক্তব্য যে, "আমরা আল্লাহ্‌র এবং তারই দিকে আমরা ফিরে যাবো"। যে কেউ এ পদ্ধতি ব্যবহার করবে সে দেখবে তা খুব দ্রুত ফল দিচ্ছে।

দুর্দশা, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় মানুষ নিজেকে বিভিন্নভাবে সান্তনা দেয়। উদাহরণস্বরূপ সে নিজেকে মনে করিয়ে দেয় মৃত্যু ও ভাগ্য বিড়ম্বনা সমস্ত মানুষেরই গন্তব্য। কিন্তু আল্লাহ্ পরামর্শ দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত পথ হলো 'পুড়ে যাওয়া পদ্ধতি', যা হলো এ ধরনের পরিস্থিতিতে উপরোক্ত আয়াত মুখস্ত উচ্চারণ করা। যদি মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে নিজে এবং যেসব জিনিস তার আছে এবং যেসব জিনিসের সে মালিক সেসবের মালিক হলেন আল্লাহ্ যার পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে এগুলো তার ইচ্ছা অনুযায়ী দূর করে দেয়ার। তাহলে সে কোন ক্ষতির জন্য দুঃখ করবে না এবং নিজেকে মুক্ত বোধ করবে। মানুষের জানা উচিত প্রকৃতপক্ষে সে কোন কিছুর মালিক নয়। তার মালিকানা হচ্ছে শুধু বাহ্যিক ও রূপক। বাস্তবে সবকিছুর মালিক আল্লাহ্, যিনি দেন তাঁর ইচ্ছানুসারে

এবং নিয়েও নেন তার ইচ্ছানুসারে। কারো অধিকার নেই তিনি যা করেন তাতে হস্তক্ষেপ করার।

মানুষের জানা উচিত তাকে তৈরি করা হয়েছে কামনা-বাসনাপূর্ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অভাবী করে। এ সব তার জন্মগত প্রকৃতির অংশ। অতএব যখন সালিক তার আধ্যাত্মিক সফরের সময় কোন ধরনের আকাঙ্ক্ষায় পরাভূত হয়, তখন সে সন্দেহ করে যে তার জন্য হয়তো পুরোপুরি সম্ভব নাও হতে পারে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে যাওয়া, যা হলো মুক্ত মানুষদের ইবাদতের ভিত্তি এবং তা তার ভেতরের ইচ্ছা শক্তি ও বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় এবং অসহায় বোধ করে। এ অসহায়ত্ববোধই তার আত্মগর্বকে মুছে ফেলে যা সব ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার ভিত্তি। অতএব এ স্তর অতিক্রম করার পর ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না।

নিরবতা (*সাম্‌ত্‌*) ঃ

দু'ধরণের নিরবতা রয়েছে ঃ (১) সাধারণ ও আপেক্ষিক; (২) নির্দিষ্ট ও পরম। আপেক্ষিক নিরবতা হচ্ছে অন্য লোকের সাথে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং "যতটুকু খুবই প্রয়োজন ততটুকু বলা"-এ ধরনের নিরবতা সালেকের জন্য প্রতিটি স্তরেই প্রয়োজন। এটি অন্যদের জন্যও প্রশংসনীয়। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এ ধরনের নিরবতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "নিরবতা আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের রাস্তা। কারণ আল্লাহ্‌ তা পছন্দ করেন; এটি নবীদের পদ্ধতি এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের স্বভাব।"

অন্য একটি হাদীসে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন ঃ "নিরবতা প্রজ্ঞার অংশ। এটি পরহেযগারীর চিহ্ন"।

নির্দিষ্ট ও পরম নিরবতা হচ্ছে, আল্লাহকে মৌখিক ভাবে স্মরণ করার সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

খাবার গ্রহণে মিতব্যায়িতা পালন করা (*জায়ু*) ঃ

এটি শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাব করা হয়েছে যেন তা মানসিক শান্তি ও ব্যক্তিত্বকে বিঘ্নিত না করে। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন, "বিশ্বাসী ক্ষুধায় মজা অনুভব করে। তার জন্য ক্ষুধা হচ্ছে ক্বলব ও আত্মার খাবার"।

ক্ষুধা আত্মাকে আলোকিত করে এবং একে হালকা করে, অথচ অতিরিক্ত খাওয়া একে নিস্প্রভ ও ক্লান্ত করে এবং একে আধ্যাত্মিক জগতের আকাশে ভেসে বেড়াতে বাধা দেয়। ইবাদাতসমূহের মধ্যে রোযার খুব উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। নবী (সাঃ)-এর উর্ধ্ব জগতে আরোহণের বিষয়ে কয়েকটি হাদীস এসেছে 'দায়লামীর' ইরশাদ গ্রন্থে এবং বিহারুল আনওয়ারের ২য় খন্ডে। এসব হাদীসে নবী (সঃ) কে আহমাদ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ হাদীসগুলো উপোস থাকার লাভজনক দিকের উপরে জোর দিয়েছে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সফরের সাথে এর বিস্ময়কর প্রভাব সম্পর্কে। আমার উস্তাদ মরহুম আলী আগা কাযী একদিন উপোস থাকার উপরে একটি খুব সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করলেন। সংক্ষেপে তিনি বললেনঃ

"একবার পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে তিন ব্যক্তি একসাথে ভ্রমণ করছিলেন। রাত্রি নেমে আসলে তারা তিন দিকে তিনজন রওয়ানা দিলেন খাবার পাবার আশায় এবং একমত হলেন যে, পরবর্তী দিন সকালে তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে একত্র হবেন। একজনকে ইতোমধ্যেই কেউ দাওয়াত করেছিল। দ্বিতীয় জন ঘটনা চক্রে কারো মেহমান হয়ে গেলেন। তৃতীয় ব্যক্তির কোথাও যাওয়ার মত জায়গা ছিল না। সে নিজেকে বললো যে, তার মসজিদে যাওয়া উচিত আল্লাহ্‌র মেহমান হয়ে। সে রাতটি মসজিদে কাটালো কিন্তু কোন খাবার পেল না। পরদিন সকালে তারা সেই নির্ধারিত জায়গায় জড়ো হলো এবং প্রত্যেকেই তাদের ঘটনা বর্ণনা করলো। সে সময় তখনকার নবী এ বিষয়ে ওহী লাভ করলেন ঃ "আমার মেহমানকে বলো কাল রাতে আমি তার মেযবান ছিলাম এবং আমরা সুস্বাদু খাবার দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম ক্ষুধার চেয়ে ভাল খাবার আর ছিল না।"

একাকীত্ব (*খালওয়াত্‌*) ঃ

একাকীত্বও আবার দু'ধরনের রয়েছে - সাধারণ ও নির্দিষ্ট। সাধারণ একাকীত্ব হচ্ছে অন্য কোন লোকের সাথে না মেলামেশা করা, বিশেষ করে মূর্খদের সাথে এবং তাদের সাথে শুধু তখনই সাক্ষাৎ করা যখন তা খুবই জরুরী। কোরআন বলে ঃ

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ...﴾

"এবং তাদেরকে পরিত্যাগ কর যারা ধর্মকে অবসরের বিষয় ও মশকরা হিসাবে নেয় এবং যাদেরকে এ পৃথিবীর জীবন ধোঁকা দিয়েছে।" (সূরা আন'আম ঃ ৭০)

নির্দিষ্ট একাকীত্বের অর্থ সব মানুষ থেকে দূরে থাকা। এ ধরনের একাকীত্ব প্রশংসনীয় সকল ইবাদাতের সময়। কিন্তু সাধকদের বিবেচনায় অতি প্রয়োজনীয় কিছু বিশেষ যিকিরের সময়ও। এ বিষয়ে নীচের দিকগুলো পালন করতে হবে ঃ

আধ্যাত্মিক সফরকারীর জন্য জরুরী যে, সে ভিড় থেকে এবং বিরক্তিকর শব্দ থেকে দূরে থাকবে। যেখানে সে ইবাদাত করবে তা হতে হবে পরিষ্কার ও হালাল। এমনকি দেয়ালগুলো এবং ঘরের ছাদ পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকবে। তার ঘর হবে ছোট, একজন লোক ধরার মত একটি ঘর যাতে কোন আসবাবপত্র ও কোন সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস থাকবে না যা তার মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

একজন লোক সালমান ফারসীর অনুমতি চাইলো তার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করার। তখন পর্যন্ত সালমান (রাঃ) তার নিজের জন্য কোন বাড়ি তৈরি করেন নি। তবুও তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। ঐ ব্যক্তি বললোঃ 'আমি জানি কেন আপনি আমাকে অনুমতি দিলেন না'। 'বলো কেন?', বললেন সালমান। সে বললো 'আপনি শুধু চান আমি আপনার জন্য এমন লম্বা ও এমন প্রশস্ত একটি বাড়ি বানাই যা শুধু আপনাকে জায়গা দেবে'। 'হ্যাঁ তাই, তুমি সঠিক বলেছো', বললেন সালমান। অতঃপর লোকটি সালমানের (রাঃ) জন্য তার অনুমতিক্রমে ঐ ছোট আকারেরই একটি বাড়ি তৈরি করলেন"।

রাত্রি জাগরণ (*সাহ্‌র*) ঃ

এর অর্থ সালিক যতটুকু সম্ভব ভোর হবার আগে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস করবে। সকালের ঘুমকে নিন্দা করে এবং ঐ সময় জেগে থাকাকে প্রশংসা করে আল্লাহ বলছেন ঃ

كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ • وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿﴾

"তারা রাতে অল্পই ঘুমাতো এবং রাতের শেষ অংশে ক্ষমা চাইতো।"

(সূরা যারিয়াত ঃ ১৭-১৮)

নিয়মিত পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা (*তাহারাত্*) ঃ

এর অর্থ সব সময় অজুর মাধ্যমে পবিত্র থাকা, ওয়াজিব গোসল সহ শুক্রবারের গোসল করা এবং যতটা সম্ভব অন্য সব প্রস্তাবিত বিশেষ দিনগুলোতেও মুস্তাহাব গোসলের অভ্যাস করা।

নম্রতা (*তাদারুরু*) ঃ

নম্রতা ও বিনয়ের সর্বোচ্চ অনুশীলন করা যা কান্না ও বিলাপকেও অন্তর্ভূক্ত করে।

দুনিয়াবী সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা ঃ

এর অর্থ ব্যক্তির পক্ষে যতটা সহ্য করা সম্ভব ততটা দুনিয়াবী সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা উচিত এবং নিজের স্বাস্থ্য ও রিযিকের বিষয়ে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমিত থাকা উচিত।

গোপনীয়তা (*কিত্‌মান-ই-সির্‌র্*)

এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি যা সালিক অনুসরণ করবে। বড় বড় সাধকরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন এবং এর উপর অনেক জোর দিয়েছেন। তারা তাদের ছাত্রদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন অবলোকন ইত্যাদি গোপন রাখতে বলেছেন। যদি তাক্বিয়া (গোপন করা) সম্ভব না হয় তাওরিয়াহ (দ্বৈত অর্থবোধক কথা/কাজ) অবশ্যই করতে হবে। প্রয়োজনে আধ্যাত্মিক অনুশীলন কিছু সময়ের জন্য পরিত্যাগ করতে হবে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

"চেষ্টা কর তোমাদের প্রয়োজন মেটাতে গোপনীয়তা রক্ষা করার মাধ্যমে"।

কষ্ট ও দুর্যোগের সময় তাক্বিয়া ও গোপনীয়তা এ বিষয়সমূহকে সহজ করে দেয়। যদি সালিক কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় তবে তার উচিত ধৈর্য সহ এগিয়ে যাওয়া।

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿﴾

"সাহায্য চাও ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে ; এটি সত্যিই কঠিন, শুধু বিনয়ীদের জন্য ছাড়া।" (সূরা বাকারাহ ঃ ৪৫)

এ আয়াতে সালাত (নামায) শব্দটি এর শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যা হচ্ছে আল্লাহর দিকে মনোযোগ। এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আল্লাহর স্মরণে ধৈর্য কঠিন পরিস্থিতিকে সহজতর করে এবং সফলতার রাস্তা দেখায়। এ কারণে প্রায়ই দেখা যায় যে, যারা তাদের হাতের কনি আঙ্গুল কেটে গেলে অনেক অস্থির হয়ে যায়, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়েও সামান্যতম দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না। এ সাধারণ নিয়ম অনুসারে ইমামগণ (আঃ) গোপনীয়তার উপর বিরাট জোর দিয়েছেন এবং তাক্বিয়া ছেড়ে দেয়াকে বিরাট গুনাহ হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

শেখ সাদুক (রঃ) তার আত-তাওহীদ বইতে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, "একদিন আবু বাসির ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন 'পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে কিনা'। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এ কারণে যে, সুন্নী ইমাম আবুল হাসান আশআরীর অনুসারীরা বিশ্বাস করে মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে পুনুরুত্থান দিবসে ও আখেরাতে, যা আকৃতি বা অবতার ধরা ছাড়া সম্ভব নয়।

"আল্লাহ তাঁরও উপরে যালেমরা যা বলে।" ইমাম (আঃ) বললেনঃ "আল্লাহকে দেখা এ পৃথিবীতেও সম্ভব যেমন তুমি এখনই দেখেছো।" আবু বাসির বললেন ঃ "হে নবীর সন্তান আমাকে এ ঘটনা অন্যের কাছে বর্ণনা করার অনুমতি দিন"। ইমাম তাকে তা করতে অনুমতি দিলেন না এবং বললেন ঃ " তা অন্যদের বলো না নয়তো তারা সত্য অনুধাবন করতে পারবে না এবং কোন কারণ ছাড়াই পথভ্রষ্ট হবে।"

আধ্যাত্মিক উস্তাদ ও হাদী ঃ

আধ্যাত্মিক উস্তাদও দুই প্রকারের : সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ উস্তাদ হচ্ছে সে, যে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে পথ দেখাবার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত নয়। মানুষ তার কাছে পথ খোঁজে যেহেতু তারা মনে করে সে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কোরআন বলে ঃ

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা জানে, যদি তোমরা না জানো।"

(সূরা নাহল ঃ ৪৩)

এ ধরনের উস্তাদ শুধু আধ্যাত্মিক সফরের শুরুতে সাহায্য করতে পারেন। যখন সালিক আল্লাহ্‌র গৌরবময় গুণাবলীর প্রকাশ দেখতে পায় তখন তার আর সাধারণ উস্তাদের প্রয়োজন পড়ে না।

বিশেষ উস্তাদ হচ্ছেন তিনি যাঁর বিষয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ রয়েছে অর্থাৎ তাকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ পদটি শুধু নবী (সঃ) ও তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারীরাই অধিকার করে আছেন। তাদের পথপ্রদর্শন এবং সোহবাত অতি প্রয়োজনীয় এবং কোনক্রমেই এড়াবার নয়, এমনকি সালিক আধ্যাত্মিক সফরে তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবার পরও। এ সোহবাত (সংসর্গ) শারীরিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক, কারণ ইমামগণের বাস্তব প্রকৃতি হচ্ছে তার জ্যোতির্ময় মাক্বাম যার কর্তৃত্ব এ পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জিনিসের উপর বিস্তৃত। যদিও ইমামের শরীর অন্য সকলের শরীর থেকে উন্নত তার পরও মহাজগতের উপর তার কর্তৃত্বের উৎস তার দেহ নয়। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও গুনাবলীসমূহ। এবং সেই একই নামসমূহ ও গুণাবলীসমূহ ইমামদেরও সত্তা। এজন্য ইমামরা বলেছেন, "আল্লাহ্‌কে জানা হয় আমাদের মাধ্যমে এবং আমাদের মাধ্যমে তাঁর ইবাদাত করা হয়"।

অতএব এটি বলা সঠিক যে, যে স্তরগুলো সালিক পরিক্রমণ করে তা ইমামের আলোতে অতিক্রম করে এবং প্রত্যেক স্থানে, যেখানে সে অগ্রসর হয় সেই স্থানটিও ইমাম নিয়ন্ত্রণ করেন। সালিক তার পুরো সফরটিতেই ইমামের সংসর্গ উপভোগ করে এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এমনকি তার গন্তব্যে পৌঁছার পরও সে ইমামের সংসর্গের প্রয়োজনে থাকে; কারণ ইমামই তাকে নিয়ম কানুন শিক্ষা দেন যা আলামে লাহুতে বা আল্লাহ্‌র সাত্তিক জগতে প্রয়োজন পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক সফরের প্রতিটি স্তরে ইমামের সংসর্গ অতি জরুরী। এ বিষয়ে আরো অনেক সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। সেগুলো হয়তো সালিক নিজেই তার পছন্দ অনুযায়ী আবিষ্কার করবে।

একবার মহিউদ্দীন আল আরাবী এক হাদীর (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) কাছে গেলেন এবং তার কাছে অভিযোগ করলেন অন্যায় ক্রমে বাড়ছে এবং গুনাহ্ চারদিকে। হাদী (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শনকারী) তাকে বললেন আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ দিতে। এর কিছু দিন পর তিনি আরেকজন আধ্যাত্মিক হাদীর (আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক) কাছে গেলেন এবং একই অভিযোগ করলেন। এখানে হাদী তাকে বললেন তার নিজের দিকেই মনোযোগ দিতে। ইবনে আরাবী খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন দু'টি উত্তর দু'রকম হলো। আধ্যাত্মিক হাদী বললেন: "হে প্রিয়! উত্তরতো একটি এবং একই। উনি তোমাকে তোমার সাথীর (*রাফিক্*) দিকে মনোযোগ দিতে বলেছেন এবং আমি তোমাকে পথের (*তারিক্*) দিকে মনোযোগ দিতে বলেছি।"

আমি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলাম এটিই দেখাতে যে, একদিকে আল্লাহ্র দিকে সফর করা এবং অন্যদিকে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর মাঝ দিয়ে ভ্রমণ শেষে ইমামের মাক্বামে পৌছানোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এ দুটি বিষয় শুধু কাছাকাছিই নয় বরং একই রকম। এ পর্যায়ে দ্বৈততার কোন ধারণার সুযোগ নেই। এক সত্তার গৌরবময় নূর ছাড়া আর কিছু নেই যা বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হয়। মাঝে মাঝে একে বলা হয় আল্লাহ্র নামসমূহ ও গুণাবলী এবং মাঝে মাঝে ইমামের সত্তা অথবা তাঁর জ্যোতি বলে বর্ণনা করা হয়।

সাধারণ হাদী যোগ্য কিনা তা জানার জন্য তাকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন এবং তার সাথে বেশ কিছু সময় ধরে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। এরকম অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন, অন্যরা কী চিন্তা করছে তা জানা, আগুন অথবা পানির উপরে হাঁটা, অতীতের ঘটনাবলী বর্ণনা করা অথবা ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদি কোন ব্যক্তির আল্লাহ্র প্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত নয়। এ ধরণের কাজ করা সম্ভব হয় আধ্যাত্মিক দৃশ্য অবলোকনের শুরুতেই, কিন্তু আল্লাহ্র নৈকট্যের মাক্বাম এ স্তর থেকে অনেক দূরে। প্রকৃতপক্ষে কেউ হাদী হতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র পরম সত্তা থেকে নূর লাভ করে। শুধু আল্লাহ্র নামসমূহ ও তার গুণাবলীর প্রকাশ্য নূর লাভ করাই যথেষ্ট নয়।

সালিক সম্পর্কে বলা হয় যে, সে আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকাশ্য নূর লাভ করছে তখন, যখন সে অনুভব করে জ্ঞান, শক্তি এবং জীবন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র জ্ঞান, আল্লাহ্র শক্তি এবং আল্লাহ্র জীবন। এ স্তরে সালিক যদি কিছু

শোনে সে অনুভব করে আল্লাহ তা শুনেছেন এবং যখন সে কিছু দেখে সে অনুভব করে আল্লাহ্ তা দেখেছেন। সে অনুভব করতে পারে যে আল্লাহ্ই একমাত্র জানেন এবং প্রত্যেক অস্তিত্বশীল সত্তার জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র নিজেরই জ্ঞান।

সালিক সম্পর্কে বলা হয় যে, সে আল্লাহ্র নামগুলোর গৌরবময় নূর লাভ করছে তখন, যখন সে আল্লাহ্র গুণাবলী নিজের ভেতরই দেখতে পায়। উদাহরণস্বরূপ, সে অনুভব করে আল্লাহ্ই হচ্ছেন একমাত্র জ্ঞান ধারণকারী এবং সালিকের নিজের জ্ঞানও আল্লাহ্রই জ্ঞান। অথবা সে অনুভব করে একমাত্র জীবিত সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং সালিক নিজে জীবিত নয় বরং তার জীবন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই জীবন। অন্য কথায় সে অনুমানে অনুভব করে যে, "আল্লাহ্ ছাড়া জানেন, জীবিত এবং শক্তিশালী কেউ নেই।" যদি সালিক আল্লাহ্র একটি অথবা দুটি নামের প্রকাশ্য নূর লাভ করে তাহলে এটি জরুরী নয় যে, সে আল্লাহ্র অন্যান্য নামেরও প্রকাশিত নূর লাভ করবে।

আল্লাহ্র সত্তার গৌরবময় নূর সালিক তখনই লাভ করে যখন সে নিজেকে পুরোপুরি ভুলে যায় এবং নিজের কোন চিহ্ন অথবা তার অহংবোধের কোন চিহ্ন খুঁজে পায় না। "আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।" এ ধরনের লোক কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারে না এবং শয়তান তাকে লোভ দেখিয়ে ভোলাতে পারে না। সালিকের বিষয়ে শয়তান আশা হারায় না যতক্ষণ সালিক তার অস্তিত্বকে বিলীন না করে। কিন্তু যখন সালিক আল্লাহ্র সাত্তিক জগতের (আলামে লাহুত) নিরাপদ জগতে প্রবেশ করে নিজের ব্যক্তি সত্তা ও অহংবোধকে বিলীন করে দিয়ে, তখন শয়তান তাকে প্রতারিত করবার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে। একজন সাধারণ হাদীকে অবশ্যই এ মাক্বামের হতে হবে। অন্যথায় আশেকের জন্য নিরাপদ নয় যে, সে যেকোন লোকের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করবে।

এটি ঠিক নয় যে, সালিক তার প্রয়োজনের জন্য যে কোন দোকানে হুট করে ঢুকে পড়বে অথবা যে কোন ভনিতাকারীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে। তার উচিত প্রস্তাবিত হাদী সম্পর্কে পূর্ণ খোঁজ খবর নেয়া এবং যখন তা করা সম্ভব নয়, তখন সে আল্লাহ্তে আস্থা রাখবে এবং প্রস্তাবিত হাদীর শিক্ষার সাথে নবী (সাঃ) ও ইমামদের শিক্ষার সাথে মিলিয়ে দেখবে এবং তাদের শিক্ষাকেই শুধু মানবে। যদি সে তা করে তাহলে সে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকবে। কোরআন বলে ঃ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ •

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿﴾

"শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই তাদের উপর, যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌তে আস্থা রাখে। তার ক্ষমতা শুধু তাদের উপর যারা তাকে বন্ধু বানায় এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার নেয়।" (সূরা নাহল ঃ ৯৯-১০০)

প্রতিদিনের মৌখিক স্মরণ (*যিকির*) ঃ

মৌখিক যিকিরের পরিমাণ ও পদ্ধতি কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে হাদী কী পরামর্শ দেন। যিকিরের বিষয়গুলো ঔষধের মত যা কারো কাজে লাগবে আবার কারো কাজে লাগবে না। কোন কোন সময় এমনও হতে পারে যে, সালিক তার নিজের মত অনুযায়ী দুটি বিষয় যিকির করছে এবং এর একটি তাকে বহুত্বের দিকে টানছে, অন্যটি একত্বের দিকে টানছে। তাদের পরস্পর বিরোধিতা উভয়ের প্রভাবকেই বাতিল করে দিচ্ছে এবং তা কোন কাজেই আসছে না। উল্লেখ করা সমীচীন যে, যেসব বিষয় যিকির করা সবার জন্য অনুমতি নেই সেগুলোর জন্য সাধারণ হাদীর অনুমতি প্রয়োজন। যেগুলোর ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ নেই সেসবের জন্য সাধারণ অনুমতি ইতোমধ্যেই রয়েছে।

সাধকরা অর্থের দিকে খেয়াল না রেখে কোন বিষয় যিকির করাকে কোন মূল্যই দেন না। অর্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মুখে বার বার বলা কোন কাজে আসে না।

খারাপ চিন্তার অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ,
চিন্তা-গবেষণা (ফিকর) ও স্মরণ (যিকির) ঃ

এ তিনটি স্তর লক্ষ্য হাসিলের পথে বিরাট গুরুত্ব রাখে। অনেক মানুষ যারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয় তারা এ স্তরগুলোর যে কোন একটিতে থেমে যায় অথবা এগুলোতে পৌঁছাবার পথে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ স্তরগুলোতে যে বিপদগুলো লুকায়িত আছে তা হলো মূর্তি পূজা, নক্ষত্র পূজা, আগুন পূজা এবং মাঝে মাঝে নাস্তিকতা, ফেরাউনিবাদ, অবতারবাদ এবং আল্লাহ্‌র সাথে

নিজেকে মিলিয়ে ফেলা যা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। এগুলো শয়তানের প্ররোচনায় হয় যখন মন খারাপ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে না। যেহেতু সালিক ভনিতার উপত্যকা থেকে এখনও বের হয়ে আসেনি, আল্লাহ্‌র নামসমূহ অথবা গুণাবলী প্রকাশ হওয়ার কারণে সে বিশ্বাস করতে শুরু করতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তার ভিতরে বাস করছেন। অবতারবাদ বলতে একেই বোঝায় যা প্রকৃত পক্ষে কুফুরী ও শিরক; অন্যদিকে, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস বহুত্বের সকল ধারণাকে বাতিল করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের তুলনায় প্রত্যেক অস্তিত্বকে একটি কল্পনা ও প্রত্যেক অস্তিত্বকে একটি ছায়া বলে মনে করে। যখন সালিক এ স্তর অর্জন করে তখন সে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব অনুভব করে না।

শয়তানী প্ররোচনা (ওয়াসওয়াসা) দূরীকরণ

সালিক তার উপরে অবশ্যই যেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে যাতে কোন চিন্তা তার মনে হঠাৎ করে ঢুকে না পড়ে এবং কোন কাজ যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে সে করে না ফেলে। প্রয়োজনীয় পরিচালন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন খুব সহজ নয়। তাই বলা হয় ওয়াসওয়াসার মূলোৎপাটন হচ্ছে আত্মা পবিত্র করার শ্রেষ্ঠ উপায়। যখন সালিক এ স্তরে এসে পৌঁছায় তখন সে শুরুর দিকে নিজেকে খারাপ চিন্তা এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসার কাছে পরাভূত দেখতে পায়। অদ্ভুত চিন্তা তার মনে আসে। সে প্রায়ই অতীত ঘটনা চিন্তা করে যেগুলো সে ভুলে গিয়েছিল এবং কাল্পনিক ঘটনা দেখতে পায় যা কখনও বাস্তবে ঘটা সম্ভব নয়। এ সময় সালিক যেন দৃঢ় ও মজবুত থাকে এবং তার উচিত প্রতিটি ঘৃণিত চিন্তাকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার মাধ্যমে দূর করা। যখনই কোন খারাপ চিন্তা তার মনে আসবে তার উচিত আল্লাহ্‌র কোন একটি নামের উপর মনোযোগ দেয়া এবং সে তা করতেই থাকবে যতক্ষণ না সেই চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। খারাপ চিন্তা দূর করার সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামসমূহের উপর মনোযোগ দেয়া। কোরআন বলে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿﴾

"নিশ্চয়ই যারা পরহেযগারী অনুশীলন করে, যখন শয়তানের কাছ থেকে খারাপ কোন চিন্তায় বিব্রত হয় তখন তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তারা (আলো) দেখতে পায়।" (সূরা আরাফ ঃ ২০১)

যাহোক, মরহুম বাহারুল উলুমের গবেষণামূলক বই অবশ্য এ পদ্ধতি গ্রহণে অনুমতি দেয় না। তিনি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার আগেই খারাপ চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা দূর করার উপর জোর দেন এবং খারাপ চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা দূর করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিকে খুবই বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা নিচে ঐ কিতাবের উপস্থাপিত যুক্তি তুলে ধরছি এবং তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার প্রস্তাব রাখছি।

ঐ বই বলে যে ঃ "অনেক হাদী আশেকদের বলেন খারাপ চিন্তা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার মাধ্যমে দূর করতে। পরিষ্কার ভাবেই এখানে স্মরণ করা মানে মনোযোগ দেয়া, কোন মৌখিক কথা বা তেলাওয়াত নয়। কিন্তু এ পদ্ধতি খুবই বিপজ্জনক, কারণ আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত মাশুককে দেখা এবং তাঁর সৌন্দর্য্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যা অনুমোদনযোগ্য নয় যতক্ষণ আর সবকিছুর উপর চোখ বন্ধ না করা হয়। কেননা মাশুকের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান অনুমতি দেয় না যে, যে তাঁকে দেখবে সে আর কেউ বা আর কিছুকে দেখুক। এটি একটি মশকরায় পরিণত হবে যদি চোখ বার বার মাশুকের দিক থেকে সরে অন্য কিছুকে দেখে এবং কোন ব্যক্তি যদি একাজ করে তাহলে সম্ভাবনা আছে একটি মারাত্মক আঘাত পাবে। কোরআন বলে ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿﴾

"যে রাহমানের স্মরণ উপেক্ষা করে, আমরা একটা শয়তানকে তার জন্য নিয়োগ করি যে তার সাথী হয়ে যায়।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)

যাহোক খারাপ চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী এক ধরনের পদ্ধতির অনুমতি লাভ করেছে। এ পদ্ধতিতে আশেক-এর মনে মাশুকের সৌন্দর্য থাকার প্রয়োজন নেই। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু শয়তানকে দূর করা। ঠিক ঐ মানুষের মত যে তার প্রেমিকাকে ডাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরাশ করবার জন্য এবং তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। এভাবে যদি আশেক কোন খারাপ চিন্তার

সম্মুখীন হয় যা থেকে পালানো তার জন্য কঠিন হয়ে দেখা দেয়, তার উচিত ঐ খারাপ চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণে নিয়োজিত হওয়া।

যাহোক, অভিজ্ঞ সাধকরা নতুনদের বলেন প্রথমে খারাপ চিন্তা দূর করে নিতে এরপর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে। এ উদ্দেশ্যে তারা তাকে বলেন কোন বিন্দুর উপরে যেমন কোন পাথরের অথবা কাঠের টুকরার উপর কিছুক্ষণের জন্য অপলক চোখ রাখতে। এটি আরো ভাল হয় যদি তা চল্লিশ দিনের জন্য করা হয়। এরই মধ্যে 'আউযুবিল্লাহ' 'আসতাগফিরুল্লাহ' এবং 'ইয়া ফাআল' বার বার যিকির করতে হবে, বিশেষ করে সকাল ও রাতের নামাযের পর। চল্লিশ দিন সম্পূর্ণ করার পর আশেক কিছু সময়ের জন্য তার ক্বলবের উপর মনোযোগ দিবে এবং কোন চিন্তাকে তার মনে ঢুকতে দিবে না। যদি কোন খারাপ চিন্তা তার মনে আসে তার উচিত 'আল্লাহ' এবং 'লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ' শব্দগুলো যিকির করা এবং তা বার বার করতে থাকা ঐ পর্যন্ত যখন সে কিছুটা অন্তরে নূরগ্রস্থ হবে। এ পদ্ধতি চালিয়ে যাবার সময় তাকে খুব বেশি বেশি 'আসতাগফিরুল্লাহ', 'ইয়া ফাআলু' এবং 'ইয়া বাসিতু' যিকির করতে হবে। যখন সে এ স্তর অর্জন করে তখন আশেক মনে মনে যিকির করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। যদি সে চায় খারাপ চিন্তাকে চিরকালের জন্য একেবারে বিদায় করে দিতে তাহলে স্মরণ (যিকির) ও গভীর ভাবনার স্তরে পৌঁছালে তার খারাপ চিন্তা ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।" এ হচ্ছে বাহারুল উলুম-এর উপর উল্লেখিত প্রবন্ধের সারমর্ম।

যাহোক, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে খারাপ চিন্তা দূর করা নাকশবন্দী ত্বরীকা থেকে নেয়া হয়েছে যা একটি সূফী ত্বরীকা। তুরস্কের কিছু জায়গায় তা দেখতে পাওয়া যায়। এ ত্বরীকার নামকরণ হয়েছে এর প্রধান হাদী খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দীর নামে।

কিন্তু আখুন্দ মোল্লাহ্ হুসেইন কুলী হামাদানী এ পদ্ধতিতে সম্মত নন। যে পদ্ধতি তিনি এবং তার ছাত্ররাও অনুসরণ করেন তার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও গভীর চিন্তা-গবেষণা করা, কিন্তু তারা আরো জোর দেন মোরাক্বাবাহ ও মোশাহাদাহ্‌র (প্রত্যক্ষ করা) উপর।

আমরা ইতোমধ্যেই সংক্ষেপে মোরাক্বাবাহ বর্ণনা করেছি এবং এখন এর বিভিন্ন স্তরের বিস্তারিত কিছু আলোচনা করতে চাই ঃ

প্রথম ধাপ ঃ মোরাক্বাবাহ্‌র প্রথম ধাপ হচ্ছে সব হারাম থেকে দূরে থাকা এবং বাধ্যতামূলক কাজগুলো সম্পাদন করা। কোন অবহেলা ও অলসতা এ বিষয়ে অনুমোদনযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ আশেক তার মোরাক্বাবাহকে আরো গভীর করবে এবং চেষ্টা করবে যেন সে যা করে তার সবকিছু শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করবে। সে সাবধানতার সাথে সেগুলো থেকে বিরত থাকবে যা অবসর কাটানো ও ফূর্তি হিসাবে পরিচিত। একবার যখন এ অভ্যাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন তার জন্য এ বিষয়ে নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন পড়বে না।

তৃতীয় ধাপ ঃ তার বিশ্বাস করা এবং স্বীকার করা উচিত যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সবখানে উপস্থিত এবং আল্লাহ্, যিনি সব কিছুর দেখাশোনা করেন, তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। এ মোরাক্বাবাহটি সবসময় এবং সব পরিস্থিতিতে পালন করতে হবে।

চতুর্থ ধাপ ঃ এটি তৃতীয় ধাপের উচ্চতর স্তর। এ স্থানে আশেক নিজেই অনুভব করে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সব জায়গায় উপস্থিত। সে আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখতে পায়। পবিত্র নবী (সাঃ) তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মোরাক্বাবাহর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যখন তিনি তার এক বড় সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) কে বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর যেন তুমি তার দিকে তাকিয়ে আছো, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।" এ হাদীসটি ইঙ্গিত করে ইবাদাতকারীর আল্লাহ্‌কে দেখা উপরের স্তরের ইবাদাত, তাকে আল্লাহ দেখছেন এমন ইবাদাত থেকে।

যখন আশেক এ স্তরে উপস্থিত হয় তখন তার উচিত কোন একটি ইবাদাতের মাধ্যমে তার খারাপ চিন্তা দূর করা। ইসলামী আইন মনোনিবেশের জন্য কোন কাঠ ও পাথরের টুকরার দিকে তাকিয়ে থাকার অনুমতি দেয় না।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ চিন্তা দূর করবার জন্য অস্ত্র হিসাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ ও দোয়া প্রশংসনীয় যা নিজেই একটি ইবাদাত। খারাপ চিন্তা দূর করার সবচেয়ে ভাল ও সংক্ষিপ্ত পথ হলো নিজের প্রতি মনোযোগ দেয়া। এ পদ্ধতি ইসলাম দ্বারা অনুমোদিত। কোরআন বলে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ...﴾

"বিশ্বাসীরা, তোমাদের নিজেদের যত্ন নাও। যে ভুল করে সে তোমাদেরকে কোন ক্ষতি করতে পারে না যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো।"

(সূরা মায়েদাহ্ ঃ ১০৫)

নিজের উপর চিন্তা নিবিষ্ট করার পদ্ধতিকে আখুন্দ মোল্লা হুসেইন কুলী প্রস্তাব করেছেন এবং তার ছাত্ররা সবসময় তা করেছেন, যারা বলেন নিজের সম্পর্কে জ্ঞান অবধারিতভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়।

ইরফানের (আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের) উস্তাদদের সিলসিলা ইমাম আলী (আঃ) পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা দেন এমন একশটির উপর সূফী ত্বরীকা রয়েছে। কিন্তু প্রধান ত্বরীকা পঁচিশটির বেশি নয়। এসবগুলোই পেছন দিকে ইমাম আলীর (আঃ) কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। এদের বেশির ভাগই সুন্নী মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত। মাত্র দুই কি তিনটি হচ্ছে শিয়া। এদের কয়েকটি মারুফ কারখীর মাধ্যমে ইমাম আলী রেযা (আঃ)-এর কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু এ ত্বরীকাগুলোর কোনটিরই আমরা অনুসরণ করি না এবং মরহুম আখুন্দ সাহেবের নির্দেশনা অনুসরণ করি, যার এ ত্বরীকাগুলোর সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।

একশ বছরেরও আগে শুসতারে একজন প্রথিতযশা জ্ঞানী এবং ক্বাযী (বিচারক) বাস করতেন যার নাম ছিল আগা সাইয়্যেদ আলী শুসতারী, অন্যান্য সুপরিচিত আলেমদের মতই তার পেশা ছিল শিক্ষকতা ও বিচার কাজ। অনেক মানুষ তার সাথে দেখা করে উপদেশ চাইতো। একদিন হঠাৎ কেউ তার দরজায় কড়া নাড়লো। যখন আগা সাইয়্যিদ আলী তা খুললেন তিনি দেখলেন একজন তাঁতী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী চায় জানতে চাইলে লোকটি বললো: "একটি বিশেষ সম্পত্তির মালিকানার বিষয়ে আপনার কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আপনি যে রায় দিয়েছেন তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সম্পত্তিটি একজন ইয়াতিম শিশুর এবং এর দলিল অমুক জায়গায় পোঁতা আছে। যে পথ আপনি অনুসরন করেছেন তাও ভুল। আয়াতুল্লাহ শুসতারী বললেন "তুমি কি বলতে চাও আমার রায় ভুল ছিলো?' তাঁতী বললো ঃ 'আমি আপনাকে

যা বললাম তা সত্য।' একথা বলার পর তাঁতী চলে গেলো। আয়াতুল্লাহ ভাবতে শুরু করলেন কে এ লোক এবং সে কি বললো? আরো খোঁজ করে দেখা গেলো কথিত দলীলটি তাঁতীর কথা অনুযায়ী ঐ স্থানেই পোঁতা ছিলো এবং যে স্বাক্ষীদের উপস্থিত করা হয়েছিলো তারা সবাই মিথ্যাবাদী ছিলো। আয়াতুল্লাহ ভয় পেয়ে গেলেন এবং নিজেকেই বললেন, "আমার আগের বিচারগুলোও হয়তো ভুল ছিলো।" তিনি খুবই ভয় পেলেন। পরবর্তী রাতে তাঁতী আবার দরজায় কড়া নাড়লো এবং বললো "আপনি যে পথ অনুসরণ করছেন তা সঠিক নয়"। তৃতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটলো। তাঁতী বললো, "সময় নষ্ট করো না, তোমার গৃহস্থালী জিনিস সব একত্র করে বিক্রী করে দাও এবং নাজাফের দিকে রওয়ানা দাও। যা বলছি তাই করো এবং (ছয়) মাস পর আমার জন্য নাজাফের ওয়াদিউস সালামে[১] অপেক্ষা করো। মরহুম শুসতারী নাজাফে চলে গেলেন। যখনই তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন তিনি সেই তাঁতীকে সূর্যোদয়ের সময় ওয়াদিউসসালামে দেখলেন যেন তিনি মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ করে উদয় হলেন। তিনি কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং তিনি তাঁতীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এত উচ্চ মাক্বামে উঠলেন যে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

মরহুম সাইয়্যেদ আলী শুসতারী শেইখ মোরতুজা আনসারীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ধর্মীয় ও ফিক্‌হ বিষয়ে তার বক্তব্য শুনতে যেতেন। শেইখ মোরতুজা আনসারী ও সাইয়্যেদ আলী সাহেবের আখলাকের উপর দরসে সপ্তাহে একদিন যোগ দিতেন। শেইখ মোরতুজা আনসারীর মৃত্যুর পর মরহুম সাইয়েদ আলী শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শেইখ মোরতুজা আনসারী যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেখান থেকে দরস দেয়া শুরু করলেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন বাঁচেন নি এবং ছ'মাস পরেই ইন্তেকাল করেন। যা হোক এ অল্প সময়ের মধ্যেই সাইয়্যেদ আলী সাহেব মোল্লা হুসেইন কূলীকে পথ দেখালেন যে ছিলো শেইখ মোরতুজা আনসারীরই একজন বিশিষ্ট ছাত্র। মোল্লা হুসেইন কুলী আগা সাইয়্যেদ আলী সাহেবের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং মাঝে মাঝে তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। যখন সাইয়্যেদ আলী সাহেব শেইখ মোরতুজা আনসারী সাহেবের স্থলাভিত্তিক হলেন তিনি মোল্লা হুসেইন কূলীকে একটি সংবাদ পাঠালেন। যাতে তিনি লিখলেন, "যে পথ তুমি বর্তমানে অনুসরণ

১ ওয়াদিউস সালাম- ইমাম আলী (আঃ) এর মাযার সংলগ্ন কবরস্থান।

করছো তা ত্রুটিযুক্ত। চেষ্টা করো উচ্চতর মাকাম অর্জন করতে।" পরিশেষে সাইয়্যেদ আলী সাহেব মোল্লা হুসেইন কূলীকে তার পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য বোঝাতে সক্ষম হলেন। ফলে বেশীদিন গেলো না মোল্লা হুসেইন কুলী তার সময়ে আখলাক, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধিতে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। মোল্লা হুসেইন কুলীও বেশ কিছু সম্মানিত এবং যোগ্য ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যারা প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক জগতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তার নামকরা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হাজ্বী মির্যা জাওয়াদ আগা মালিকি, আগা সাইয়্যেদ আহমাদ কারবালাই তেহরানী, আগা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাঈদ হাব্বুবী এবং হাজ্বী শেইখ মোহাম্মদ বাহারী। আমার হাদী ছিলেন মরহুম হাজ্বী মির্যা আলী আগা কাযী যিনি ছিলেন আগা সাইয়্যেদ আহমাদ করবালাইর একজন ছাত্র। এটিই হচ্ছে আমার হাদীর সিলসিলা যা মরহুম শুসতারীর মাধ্যমে ঐ তাঁতী পর্যন্ত পৌঁছায়। যাহোক, সেই তাঁতী কে ছিলেন এবং কোত্থেকে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা এখনও জানা যায়নি।

আমার হাদী আগা ক্বাযী 'নিজেকে জানো' পদ্ধতি অনুসরণ করতেন আখুন্দ মোল্লা হুসেইন কুলীর মতই এবং খারাপ চিন্তা ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করতে নিজের দিকে প্রথমে মনোযোগ দেয়ার আহবান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন সালেকের উচিত দিনে অথবা রাতে একটি সময় নির্দিষ্ট করা এবং সে সময় নিজের প্রতি মনোযোগ দেয়া। আধা ঘন্টা বা তার চেয়ে কিছু বেশি সময়ের জন্য। প্রতিদিনকার এ অনুশীলন ধীরে ধীরে তার ক্বলবকে শক্তিশালী করবে এবং খারাপ চিন্তা দূর করে দিবে। একই সময়ে সে ধীরে ধীরে তার নিজের আত্মা সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করবে এবং ইনশাআল্লাহ্ তার উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

যারা নিজেদের মনকে খারাপ চিন্তা থেকে মুক্ত করতে সফল হয় এবং শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নূর লাভ করে তাদের বেশির ভাগই তাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় দু'ভাবে, হয় কোরআন পড়বার সময় তাদের মনোযোগ হঠাৎ করে পাঠকের দিকে চলে যায় এবং তাদের কাছে প্রকাশ করা হয় প্রকৃতপক্ষে পাঠক ছিলেন আল্লাহ্; অথবা পর্দাগুলো উঠে যায় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্‌র (নবীর নাতি ইমাম হুসেইন (আঃ) সুপারিশক্রমে। যিনি এ বিষয়ে পর্দা তোলায় এবং আশেকদের রাস্তার উপর প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

দু'টো জিনিস রয়েছে যা ইরফানী জ্ঞানে নূর লাভে বিশেষভাবে সাহায্য করে - (১) মোরাক্বাবাহর সকল স্তর অতিক্রম করা, (২) নিজের উপর মনোনিবেশ করা। যদি আশেক এ দুটো জিনিস লাভ করতে পূর্ণ মনোযোগ দেয় তাহলে সে ধীরে ধীরে অনুভব করবে বৈচিত্র্যতা সত্যেও সমস্ত বিশ্ব জগতের দেখাশোনা একটি উৎস থেকে হচ্ছে আর সেটিই হচ্ছে সব কিছুর উৎস যা কিছু এ পৃথিবীতে ঘটছে। এ পৃথিবীতে যা আছে এমন যে কোন সম্পূর্ণতা, উন্নত গুণ অথবা সৌন্দর্য হচ্ছে ঐ উৎস থেকে উপহার। প্রত্যেকটি জিনিস তার ক্ষমতা অনুযায়ী অস্তিত্বের, সৌন্দর্যের ও রাজকীয়তার অংশ লাভ করেছে। পরম উদারের উদারতা সবার প্রতি কিন্তু প্রত্যেক অস্তিত্বশীল তার অংশ লাভ করে তার ক্ষমতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী।

যাহোক, যদি সালিক পূর্ণ মোরাক্বাবাহ ও নিজের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখে তাহলে ধীরে ধীরে চারটি পৃথিবী তার কাছে প্রকাশ করা হবেঃ

প্রথম পৃথিবী - ক্রিয়ার একত্ব (*তাওহীদ-ই-আফ'য়াল*) ঃ

শুরুতে সালিক অনুভব করবে যে তার জিহ্বা যা বলে, তার কান যা শোনে এবং তার হাতগুলো, পাগুলো ও অন্যান্য অঙ্গ যা করে তার সবগুলোর উৎস হচ্ছে সে নিজে। সে ভাবে সে যা পছন্দ করে তাই সে করে। পরে সে অনুভব করে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সেগুলোর উৎস হচ্ছে সে নিজে। এরপরের ধাপে অনুভব করে যে তার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং এ সম্পর্কের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহ সৃষ্টির কাছে পৌঁছায়। শেষ পর্যন্ত সে অনুভব করে যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সব ক্রিয়ার ও ঘটনার একমাত্র উৎস ।

দ্বিতীয় পৃথিবী - গুণাবলীর একত্ব (*তাওহীদ-ই-সিফাত্*) ঃ

এ পৃথিবী প্রথম পৃথিবীর পরে আসে। এ স্তরে সালিক যা শোনে এবং দেখে সে অনুভব করে যে আল্লাহ্ তার এ শোনার ও দেখার উৎস। পরবর্তীতে সে অনুভব করে আল্লাহ্ হচ্ছেন সব জ্ঞান, শক্তি, জীবন, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির উৎস-তা যেখানেই পাওয়া যাক এবং তা যে আকারেই থাক।

তৃতীয় পৃথিবী - নামসমূহের একত্ব (*তাওহীদ-ই-আসমা*) ঃ

এ পৃথিবী আসে দ্বিতীয় পৃথিবী পর। এ স্তরে আশেক অনুভব করে আল্লাহ্‌র গুণাবলী কোন ভাবেই তার সত্তা থেকে পৃথক নয়। যখন সে দেখে আল্লাহ্ জানেন, সে অনুভব করে তার নিজের জানাটাও আল্লাহ্‌রই জানা। একইভাবে সে মনে করে যে তার ক্ষমতা থাকা, তার দৃষ্টি শক্তি এবং তার শ্রবণ শক্তি আল্লাহ্‌রই ক্ষমতা থাকা, তাঁরই দৃষ্টি শক্তি এবং তাঁরই শ্রবণ শক্তি, কারণ সে নিশ্চিত নীতিগতভাবে সারা বিশ্বজগতে একজনই সত্তা রয়েছেন যাঁর ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি দেখেন ও শোনেন। এটি তাঁর ক্ষমতা, তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং তাঁর শ্রবণশক্তি যা সকল অস্তিত্বশীল সত্তাতে তার গ্রহণ ক্ষমতানুযায়ী প্রতিফলন ঘটে।

চতুর্থ পৃথিবী - সত্তার একত্ব (*তাওহীদ-দার-যাত্*) ঃ

এ পৃথিবী তৃতীয় পৃথিবীর উপরে অবস্থিত। সালেকের কাছে আল্লাহ্‌র সত্তার গৌরব প্রকাশ পাবার পর এ পৃথিবী প্রকাশিত হয়। এ স্তরে সে অনুভব করে যে একজনই মাত্র সত্তা রয়েছেন যিনি সকল ক্রিয়া ও গুণাবলীর উৎস। এ পর্যায়ে তার মনোযোগ থাকে একমাত্র সত্তার উপর, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর দিকে নয়। সে এ স্তরে পৌঁছায় শুধু তখনই যখন সে নিজের অস্থায়ী অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলীন করে ফেলে এবং আল্লাহ্‌তে হারিয়ে যায়। এটি খুবই কঠিন হবে ও সত্য থেকে দূরে হবে যদি এ স্তরকে আল্লাহ্‌র সত্তার অথবা আল্লাহ্‌র একত্বের মাক্বাম বলা হয়। কারণ বাস্তবতা হচ্ছে যা বলা যায় অথবা লেখা যায়, এমন যে কোন নামেরও বহু উপরে। আল্লাহ্‌র সত্তাকে কোন নাম দেয়া যায় না এবং কোন মাক্বামও চিন্তা করা যায় না। 'আল্লাহ্‌কে অনুমান করা যায় না' এ কথাটিরও বহু উপরে আল্লাহ্। কারণ নেতিবাচক কথাও অর্থ করবে যে, তাঁর কোন সীমাবদ্ধতা আছে অথচ তিনি সকল সীমাবদ্ধতার উপরে। যখন সালিক এ স্তর অর্জন করে তার আত্মসত্তা ও অহংবোধ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। সে নিজেকে চিনবে না এবং আর কাউকেও চিনবে না, চিনবে শুধু আল্লাহ্‌কে।

এ পৃথিবীগুলোর প্রত্যেকটির ভিতর দিয়ে এগোবার সময় সালিক তার সত্তার এক একটি অংশ বিলীন করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়।

প্রথম পৃথিবীতে সে বিলীন হওয়ার স্তরে প্রবেশ করে, কারণ সে বুঝতে পারে যে তার নিজের কাজগুলোর উৎস সে নিজে নয় বরং সব কিছুই আল্লাহ্ থেকে। এভাবে সে তার ক্রিয়ার চিহ্ন বিলীন করে ফেলে।

দ্বিতীয় পৃথিবীতে গুণাবলীর প্রকাশ ঘটার ফলে সে অনুভব করে যে জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের গুণাবলীগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌রই। এভাবে সে নিজের গুণাবলীগুলোর চিহ্ন মুছে ফেলে।

তৃতীয় পৃথিবীতে সালিক আল্লাহ্‌র নামসমূহের প্রকাশ লাভ করে এবং অনুভব করে আল্লাহ্ একাই আছেন, জানেন এবং করেন ইত্যাদি। এভাবে সে তার নিজের নামের চিহ্ন ও পদবী মুছে ফেলে।

চতুর্থ পৃথিবীতে সে আল্লাহ্‌র সত্তার গৌরবের প্রকাশ দেখতে পায়। ফলে সে তার নিজের পরিচিতি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে এবং অনুভব করে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই।

সাধকরা আল্লাহ্‌র সত্তার গৌরবময় প্রকাশকে সীমোরগ (ঈগল সদৃশ কল্পিত পাখী) বলে অভিহিত করেন যাকে শিকার করা যায় না। তারা এ শব্দটি ব্যবহার করেন পরম সত্তার বিষয়ে এবং যা 'গুপ্ত ভাণ্ডার' হিসাবেও বর্ণিত এবং সে এক সত্তা যার কোন নাম নেই, নেই কোন বর্ণনা।

হাফেজ শিরাযী তার কবিতায় এ বষিয়টি খুব আকর্ষণীয়ভাবে সুন্দর রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন ঃ "একজন বৃদ্ধ আধ্যাত্মিক দর্শক ও সাধক আমাকে এ ঘটনাটি বলেছেন যা আমি কখনও ভুলবো না ঃ একদিন এক ধার্মিক ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে সে এক মাতালকে বসে থাকতে দেখলো, যে তাকে বললো ঃ "আশেক, যদি তোমার কাছে কোন টোপ থাকে তাহলে এখানেই তোমার ফাঁদ বসাও"। আশেক বললেন ঃ "আমার একটি ফাঁদ আছে তবে আমি যে একটি সীমোরগ ধরতে চাই"। মাতাল বললো ঃ তুমি শুধু তখনই তা ধরতে পারবে যদি তুমি জানো তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এর বাসা কোথায় কেউ জানেনা। "তা ঠিক", বললেন আশেক; "কিন্তু নিরাশ হওয়া যে এর চেয়েও মারাত্মক দুর্যোগ"। দেখুন কিভাবে এ মানুষটি আশা হারায় নি। এটি সম্ভব যে একাকী মানুষটি সেই নিখুঁত সত্তার কাছে পথ প্রদর্শিত হবে তাঁরই নিয়োগপ্রাপ্ত কোন হাদীর মাধ্যমে।

এটি ঠিক যে সীমোরগ ধরা সম্ভব নয়, যদি তার বাসা কোথায় জানা না থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রেমিকদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারেন এবং পথ দেখাতে পারেন ঐশী একত্বের ও আত্মসত্তা বিলীন হওয়ার পৃথিবীতে।

﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾